অলৌকিক বিভীষিকা

হেমেন্দ্রকুমার রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

অলৌকিক বিভীষিকা

এক । খবরের কাগজের রিপোর্ট

বঙ্গদেশ হচ্ছে একখানি সাপ্তাহিক পত্র। তাতে এই খবরটি বেরিয়েছেঃ

সুন্দরবনের নিকটে মানসপুর। মানসপুরকে একখানি বড়সড়ো গ্রাম বা ছোটখাটো শহর বলা চলে। কারণ সেখানে প্রায় তিন হাজার লোকের বসবাস।

সম্প্রতি মানসপুরের বাসিন্দারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে সেখানে এক অলৌকিক বিভীষিকার আবির্ভাব হয়।

আসল ব্যাপারটা যে কি, কেহ-ই সেটা আন্দাজ করিতে পারিতেছে না। পুলিশ প্রাণপণে তদন্ত করিয়াও বিশেষ কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। গ্রামের চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়াছে। বন্দুকধারী সিপাহীরা সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথাপি প্রতি অমাবস্যার রাত্রে মানসপুর হইতে এক একজন মানুষ অন্তর্হিত হয়।

আজ এক বৎসর কাল ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড হইতেছে। গত বারোটি অমাবস্যার রাত্রে বারোজন লোক অদৃশ্য হইয়াছে। প্রতি দুর্ঘটনার রাত্রেই একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ করা গিয়াছে। মানসপুর সুন্দরবনের কাছাকাছি হইলেও, তার ভিতরে এতদিন ব্যাঘ্রের উৎপাত বড়-একটা ছিল না। কিন্তু দুর্ঘটনার আগেই এখন ঘটনাস্থলের চারিদিকে ঘন ঘন ব্যাঘ্রের চিৎকার শোনা যায়। ঠিক অমাবস্যার রাত্রি ছাড়া আর কোনওদিনই এই অদ্ভুত ব্যাঘ্রের সাড়া পাওয়া যায় না। এ ব্যাঘ্র যে কোথা হইতে আসে এবং কোথায় অদৃশ্য হয় কেহ-ই তা জানে না। আজ পর্যন্ত কেহই তাকে চোখে দেখে নাই।

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অদৃশ্য হইয়াছে তাদের মধ্যে একজনও পুরুষ নাই! প্রত্যেকেই স্ত্রীলোকে এবং প্রত্যেকেরই গায়ে ছিল অনেক টাকার গহনা।

পুলিশ প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, এসমস্ত অনিষ্টরই মূল হইতেছে কোন নরখাদক ব্যাঘ্র। কিন্তু নানা কারণে পুলিশের মনে এখন অন্যরকম সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সুন্দরবনের ভিতরে আছে ভুলু-ডাকাতের আস্তানা এবং দল ও অঞ্চলে প্রায়ই অত্যাচার করিয়া থাকে। অনেক চেষ্টা ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও পুলিশ আজ পর্যন্ত ভুলু-ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। পুলিশের বিশ্বাস, মানসপুরের সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য ওই ভুলু-ডাকাতই দায়ী।

কে যে দায়ী এবং কে যে দায়ী নয়, একথা আমরা জানিনা বটে, কিন্তু এটা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানসপুরের দুর্ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য কোনও রহস্য আছে। আমরা বিশ শতাব্দীর মানুষ না হইলে এসব ব্যাপারকে হয়তো ভূতুড়ে কাণ্ড বলিয়া মনে করিতাম। ডাকাত করে ডাকাতি, ঠিক অমাবস্যার রাত্রেই চোরের মতো আসিয়া তারা কেবল এক-একজন স্ত্রীলোককে চুরি করিয়া লইয়া যাইবে কেন? আর এই ব্যাঘ্র রহস্যটাই বা কি? এ কোন দেশী ব্যাঘ্র? এ কি পাঁজি পড়িতে জানে? পাঁজি-পুথি পড়িয়া ঠিক অমাবস্যার রাত্রে মানসপুরের আসরে গর্জন-গান গাহিতে আসে? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

.

দুই । বাঘার বিপদ

খবরের কাগজখানা হাত থেকে নামিয়ে রেখে কুমার নিজের মনেই বললে, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব, আমি!..বঙ্গদেশ-এর রিপোর্টার ঠিক আন্দাজ করেছেন, এর মধ্যে নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে, হ্যাঁ, আশ্চর্য কোনও রহস্য! উপর-উপরি বারোটি মেয়ে অদৃশ্য, অমাবস্যার রাত, অদ্ভুত বাঘের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান, তার ওপরে আবার ভুলু-ডাকাতের দল! কারুর সঙ্গে কারুর কোনও সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে না, সমস্তই যেন অস্বাভাবিক কাণ্ড।...এসময়ে বিমল যদি কাছে থাকত! কিন্তু আজ সাত-আট দিন ধরে রামহরিকে নিয়ে সে যে কোথায় ডুব। মেরে আছে, শিবের বাবা বোধহয় তা জানেন না!

একখানা পঞ্জিকা নিয়ে তার ভিতরে চোখ বুলিয়ে কুমার আবার ভাবতে লাগল, হু, পরশু আবার অমাবস্যার রাত আসবে, মানসপুর থেকে হয়তো আবার এক অভাগী নারী অদৃশ্য হবে! আমার যে এখনি সেখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার এর সুযোগ তো ছেড়ে দিলে চলবে না, বিমলের কপাল খারাপ তাই নিজের দোষেই এবারে সে ফাঁকে পড়ল, আমি কি করব?..বাঘা, বাঘা!

বাঘা তখন ঘরের এককোণে বসে একপাল মাছির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করছিল। মাছিদের ইচ্ছা, বাঘার গায়ের ওপরে তারা মনের আনন্দে খেলা করে বেড়ায়, কিন্তু তার দেহটা যে মাছিদের বেড়াবার জায়গা হবে, এটা ভাবতেও বাঘা রাগে পাগল হয়ে উঠছিল। বড় বড় হাঁ করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে এক- একবারে একাধিক মাছিকে গ্রাস করে ফেলছিল কিন্তু মাছিরাও বিষম নাছোড়বান্দা, প্রাণের মায়া ছেড়ে ভন ভন ভন ভন করতে করতে বাঘার মাথা থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত বারবার তারা ছেয়ে ফেলছিল। যে বাঘা আজ জলে-স্থলে-শূন্যমার্গে কত মানব, দানব, ও অদ্ভুত জীবের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে, বিমল ও কুমারের সঙ্গে যার নাম এই বাংলাদেশে বিখ্যাত, তুচ্ছ একদল মক্ষিকার আক্রমণ আজ তাকে যেরকম কাবু করে ফেলেছে তা দেখলে শত্রুরও মায়া হবে! এমনি সময়ে কুমারের ডাক শুনে সে গা ও ল্যাজ ঝাড়তে ঝাড়তে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

কুমার বললে, বাঘা বাঘা! বিমলও নেই রামহরিও নেই,-খালি তুমি আর আমি! অমাবস্যার রাত, বাঘের গর্জন, ডাকাতের দল, মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য! শুনে কি তোমার ভয় হচ্ছে?

বাঘা কান খাড়া করে মনিবের সব কথা মন দিয়ে শুনলে। কি বুঝলে জানি না, কিন্তু বললে, ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

বাঘা, এ বড় যে-সে ব্যাঘ্র নয়, বুঝেচ? এ তোমার চেয়েও চালাক! এ তিথি-নক্ষত্র বিচার করে কাজ করে। এর সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারব কি?

ঘেউ ঘেউ ঘেউ!

তার ওপরে আছে ভুলু-ডাকাতের দল। পুলিশও তাদের কাছে হার মেনেছে, খালি তোমাকে আর আমাকে তারা গ্রাহ্য করবে কি?

ঘেউ ঘেউ ঘেউ! বলেই বাঘা টপ করে মুখ ফিরিয়ে ল্যাজের ডগা থেকে একটা মাছিকে ধরে গপ করে গিলে ফেললে!

একখানা খাম ও চিঠির কাগজ বার করে কুমার লিখতে বসল–

ভাই বিমল,

একবার এক জায়গা থেকে দলে-দলে মানুষ অন্তর্হিত হচ্ছিল শুনে সে ব্যাপারটা আমরা দেখতে গিয়েছিলুম। কিন্তু সেই কৌতূহলের ফলে বন্দি হয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল পৃথিবী ছেড়ে মঙ্গলগ্রহে।

এবারেও মানসপুরে মানুষের পর মানুষ (কিন্তু কেবল স্ত্রীলোক) অদৃশ্য হচ্ছে। শুনেই আমার চড়ুকে পিঠ আবার সড় সড় করছে। আমি আর বাঘা তাই ঘটনাস্থলে চললুম। জানি না এবারেও আমাদের আবার পৃথিবী ছাড়তে হবে কিনা!

খবরের কাগজের রিপোর্টও এই খামের ভিতর দিলুম। এটা পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে, কেন আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারলুম না। আসছে পরশু অমাবস্যা, আজ যাত্রা না করলে যথাসময়ে মানসপুরে গিয়ে পৌঁছোতে পারব না।

বিমল, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। এবারের অ্যাডভেঞ্চার-এ তুমি বেচারি ফাঁকে পড়ে গেলে। কি আর করবে বলো, যদি প্রাণ নিয়ে ফিরি, আমার মুখে সমস্ত গল্প শুনো তখন। ইতি–

তোমার কুমার

.

তিন । পটলবাবু, চন্দ্রবাবু ও মোহনলাল

পরদিন কুমার মানসপুরে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে তখন ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

আসছে কাল সেই-অমাবস্যা আসছে এবং সেই অজানা শত্রু কাল আবার কোন পরিবারে গিয়ে হানা দেবে কেউ তা জানে না। সকলে এখন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, ধনীরা বাড়ির চারিদিকে ডবল করে পাহারা বসাচ্ছে, সাধারণ গৃহস্থদের কেউ কেউ সপরিবারে স্থানান্তরে পালাচ্ছে এবং কেউ কেউ বাড়ির মেয়েদের গ্রামান্তরে পাঠিয়ে দিচ্ছে কারণ এই অদ্ভুত শত্রুর দৃষ্টি কেবল মেয়েদের দিকেই।

শহরের যুবকরা নানা স্থানে পল্লী-রক্ষা-সমিতি গঠন করেছে এবং কী করে এই আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তাই নিয়ে তাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা ও তর্কাতর্কির অন্ত নেই।

চারিদিকে এখন থেকেই সরকারি চৌকিদারের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ!

কুমার আগে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মানসপুরের অবস্থাটা ভালো করে দেখে নিলে।

অধিকাংশ স্থানেই একটি লোকের মূর্তি বারবার তার চোখে পড়ল।

সে-লোকটি খুব সপ্রতিভ ও ব্যস্ত ভাবেই সর্বত্র ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, এবং কোন। দিক দিয়ে বিপদ আসবার সম্ভাবনা, সে-সম্বন্ধ পল্লী-রক্ষা-সমিতি-র যুবকগণকে নানান রকম পরামর্শ দিচ্ছে।

একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে কুমার জানলে যে, তাঁর নাম পটলবাবু; ধনী না হলেও গাঁয়ের একজন হোমরা-চোমরা মাতব্বর ব্যক্তি এবং পল্লী-রক্ষা-সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু পটলবাবুর চোখে কুমার এমন একটি বিশেষত্ব আবিষ্কার করল, সে আর কোনও মানুষের চোখে দেখেনি।

পটলবাবুর গায়ের রং মোষের মতো কালো, তার দেহখানি লম্বায়-খুব খাটো কিন্তু আড়ে বেজায় চওড়া, মাথায় ইস্পাতের মতন চকচকে টাক, কিন্তু ঠোঁটের ওপরে ও গালে জানোয়ারের মতো বড় বড় চুল-যেন তিনি বিপুল দাড়ি-গোঁফের দ্বারা মাথার কেশের অভাবটা পূরণ করে নিতে চান।

কিন্তু পটলবাবুর চেহারার মধ্যে আসল দ্রষ্টব্য হচ্ছে তার দুই চোখ। পটলবাবুর হাত পা খুব নড়ছে, তার মুখ অনবরত কথা কইছে, কিন্তু তার চোখদুটো ঠিক যেন মরা মানুষের চোখ! শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিট মিট করে তাকিয়ে দেখছে,-পটলবাবুর চোখ দেখে এমনি একটা ভাবই কুমারের মনকে নাড়া দিতে লাগল।

চারদিক দেখে-শুনে কুমার, মানসপুর থানার ইনস্পেক্টর চন্দ্রবাবুর সন্ধানে চলল। কলকাতাতেই সে খবর পেয়েছিল যে, চন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকের সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে সে একসঙ্গে অনেককাল ধরে পড়াশুনা করেছিল। অশোক এখন কলকাতায়। কিন্তু এখানে আসবার আগে সে বুদ্ধি করে অশোকের কাছ থেকে চন্দ্রবাবুর নামে নিজের একখানি পরিচয়-পত্র আনতে ভোলেনি। কারণ, সে বুঝেছিল যে মানসপুরের রহস্য সমাধান করতে হলে চন্দ্রবাবুর কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা।

থানায় গিয়ে সে নিজের পরিচয় পত্রখানি ভিতরে পাঠিয়ে দিলে। অল্পক্ষণ পরেই তার ডাক এল।

চন্দ্রবাবু তখন টেবিলের সামনে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তাঁর বয়স হবে পঞ্চান্ন, বেশ লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মূর্তি, মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল,-দেখলে পুরাতন পুলিশ কর্মচারী বলে মনে হয় না।

কুমারকে দেখেই চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে তার একখানি হাত ধরে বললেন, তুমিই অশোকের বন্ধু কুমার? এই বয়সে তুমি এত নাম কিনেছ? তোমার আর তোমার বন্ধু বিমলের অদ্ভুত সাহস আর বীরত্বের কথা শুনে আমি তোমাদের গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়েছি। এসো, এসো, ভালো করে বোসো,-ওরে চা নিয়ে আয় রে।

কুমার আসন গ্রহণ করলে পর চন্দ্রবাবু বললেন, তারপর? হঠাৎ এখানে কি মনে করে? নতুন অ্যাডভেঞ্চার-এর গন্ধ পেয়েছ বুঝি?

কুমার হাসতে হাসতে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময়, বড়ই আশ্চর্য! জীবনে এমন সমস্যায় কখনও পড়িনি। কে বা কারা এরকম ভাবে মেয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে? বাঘ? না ভুলু-ডাকাতের দল? সবাই সাবধান হয়ে আছে, চারিদিকে কড়া পাহারা, তার ভিতর থেকেই বারো-বারোটি মেয়ে চুরি হয়ে গেল, অথচ চোর ধরা দূরের কথা–তার টিকিটি পর্যন্ত কারুর চোখে পড়ল না। এও কি সম্ভব?ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়িয়েছে, আমার চাকরি বুঝি আর টেকে না। আসছে কাল অমাবস্যা, আমিও সেজন্য যতটা সম্ভব প্রস্তুত হয়ে আছি, কাল একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব! কিন্তু কালও যদি চোর ধরতে না পারি, তা হলে আমার কপালে কি আছে জানি না–উপরওয়ালা নিশ্চয়ই ভাববেন, আমি একটি প্রকাণ্ড অপদার্থ!

কুমার সুধোলে, অমাবস্যার রাতে ঠিক কোন সময়ে মেয়ে চুরি যায়, তার কি কিছু স্থিরতা আছে?

চন্দ্রবাবু বললে, এ ব্যাপারের সবটাই আজগুবি। বিংশ শতাব্দীর এই সভ্য বাঘটি শুধু পাঁজি-পুঁথি পড়তেই শেখেনি,কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে কাজ করতেও শিখেছে! প্রতিবারেই ঠিক রাত দুপুরের সময়ে তার প্রথম চিৎকার শোনা যায়!

কিন্তু এ বাঘটা কি সত্যিই আসল বাঘ, না সবাইকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্যে কোনও হরবোলা মানুষ অবিকল বাঘের ডাক নকল করে?

সে সন্দেহ করবারও কোনও উপায় নেই। প্রতিবারেই বাঘের অগুন্তি পায়ের দাগ আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি।

কুমারের চা এল। চা পান করতে করতে নীরবে সে ভাবতে লাগল।

চন্দ্রবাবু বললেন, রহস্যের ওপর রহস্য! আজ দিনকয় হল মানসপুরে কে-একজন অচেনা লোক এসে বাসা বেঁধেছে, তাকে সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু সে যে কে, তা কেউ জানে না। লোকটার সমস্ত ব্যবহারই সন্দেহজনক! এখানকার মুরুব্বি পটলবাবু বলেন, নিশ্চয়ই সে ভুলু ডাকাতের চর! আপাতত ইচ্ছা থাকলেও আমরা তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজখবর নিতে পারছি না, কারণ এই মেয়েচুরির হাঙ্গামের জন্যে আমার আর কোনও দিকেই ফিরে তাকাবার অবসর নেই। তবে তার ওপরেও কড়া পাহারা রাখতে আমি ভুলিনি।

কুমার বললে, লোকটার নাম কী?

মোহনলাল বসু। শুনলুম, সে কোথাকার জমিদার, এখানে এসেছে বেড়াতে। যদিও এখানে সমুদ্রের হাওয়া বয়, কারণ খানিক তফাতেই সমুদ্র আছে, কিন্তু এটা কি বেড়াতে আসবার জায়গা, বিশেষ এই বিভীষিকার সময়ে?..তারপর শুনলাম সে কাল গাঁয়ের অনেকের কাছে গল্প করে বেড়িয়েছে যে তার বাড়িতে নাকি নগদ অনেক হাজার টাকা আছে। এমন বোকা লোকের কথা কখনও শুনেছ? আশপাশে প্রায়ই ভুলু-ডাকাত হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, সেটা জেনেও একথাটা প্রকাশ করতে কি তার ভয় হল না ভুলু-ডাকাতের কানে এতক্ষণ মোহনলালের টাকার কথা গিয়ে পৌঁছেছে, আর পটলবাবুর সন্দেহ যদি ভুল হয়, অর্থাৎ মোহনলাল যদি ভুলু-ডাকাতের চর না হয়, তাহলে আসছে কাল অমাবস্যার গোলমালে ভুলু যে তার বাড়িতে হানা দেবে, এটা আমি মনে ঠিক দিয়ে রেখেছি।

খানিকক্ষণ চিন্তিত ভাবে নীরব থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, এখন বুঝেছ, আমি কীরকম মুশকিলে ঠেকেছি? একেই এই মেয়ে-চুরির মামলা নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি, তার ওপরে কাল ওই মোহনলালের বাড়ির আনাচে-কানাচেই আমাকে রাত কাটাতে হবে, কারণ শ্রীমান ভুলু বাবাজি কাল হয়তো দয়া করে ওখানে পায়ের ধুলো দিলেও দিতে পারেন!

কুমার বললে, চন্দ্রবাবু, আপনি আমার একটি কথা রাখবেন?

কি কথা? তুমি যখন অশোকের বন্ধু তখন তুমি আমারও ছেলের মতো। সাধ্যমতো আমাকে তোমার আবদার রাখতে হবে বইকী!

কুমার বললে, যতদিন না এই মামলার কোনও নিষ্পত্তি হয়, ততদিন আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে থাকতে দেবেন কি?

চন্দ্রবাবু খুব খুশি মুখে বললেন, একথা আর বলতে? তোমার মতন সাহসী আর বুদ্ধিমান সঙ্গী পেলে তো আমি বর্তে যাই! তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তা হলে আমি হয়তো খুব শীঘ্রই এ মামলাটার একটা কিনারা করে ফেলতে পারব!

.

চার । আধুনিক ব্যাঘ্র

অমাবস্যার রাত!

নিঝুম রাত করছে ঝাঁ-ঝাঁ, নিরেট অন্ধকার করছে ঘুটঘুট!

তার ওপরে বিভীষিকাকে আরও ভয়ানক করে তোলবার জন্যেই যেন কালো আকাশকে মুড়ে আরও বেশি কালো মেঘের পর মেঘের সারি দৈত্যদানবের নিষ্ঠুর সৈন্যশ্রেণির মতো শূন্যপথে ধেয়ে চলেছে, দিশেহারা হয়ে!

মাঝে-মাঝে দপদপ করে বিদ্যুৎ জ্বলে জ্বলে উঠছে–সে যেন জ্বালামুখী প্রেতিনীদের আগুন-হাসি!

বন জঙ্গল, বড় বড় গাছপালাকে দুলিয়ে, ধাক্কা মেরে নুইয়ে দুরন্ত বাতাসের সঙ্গে কারা যেন পৃথিবীময় পাগলের কান্না কেঁদে ছুটে ছুটে আর মাথা কুটে কুটে বুক চাপড়ে বেড়াচ্ছে।

মানসপুর যেন এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে ডুবে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। সেখানে যে ঘরে ঘরে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হাতে করে সজাগ হয়ে বসে আছে, বাহির থেকে এমন কোনও সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব উঁচু একটা বটগাছের ডালে বসে কুমার নিজের রেডিয়মের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে আর মোটে দশ মিনিট দেরি আছে!

বন্দুকটা ভালো করে বাগিয়ে ধরে কুমার গাছের ডালের ওপরে যতটা পারে সোজা হয়ে বসল। সে নিজেই এই গাছটা পছন্দ করে নিয়েছে। যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়, তাই তার জন্যে চন্দ্রবাবু গাছের নীচেই এক চৌকিদারকে মোতায়েন রেখেছেন।...এই গাছ থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট দূরেই সেই নির্বোধ মোহনলালের বাসাবাড়ি। চন্দ্রবাবু নিজেও কাছাকাছি কোনও ঝোপঝাপের ভিতরে সদলবলে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কুমার নিজের মনে-মনেই বললে, আর আট মিনিট! আঃ, এ মিনিটগুলো যেন ঘড়ির কাটার জোড় করে টেনে রেখেছে–এরা যেন তাকে এগুতে দিতে রাজি নয়! আর ছমিনিট! চন্দ্রবাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে বারোটা বাজলেই সেই আশ্চর্য বাঘের চিৎকার শোনা যাবে। একেলে বাঘগুলোও কি সভ্য হয়ে উঠল, ঘড়ি না দেখে মানুষের ঘাড় ভাঙতে বেরোয় না?...হাওয়ার রোখ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, গাছটা বেজায় দুলছে,–শেষটা ধপাস করে পপাত ধরণীতলে না হই!..আর চার মিনিট!.আর তিন-মিনিট...আর দু-মিনিট! কুমারের হৃৎপিণ্ডটা বিষম উত্তেজনায় যেন লাফাতে শুরু করলে, ছিদ্রহীন অন্ধকারের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আগ্রহদীপ্ত চোখ দুটোকে ক্রমাগত বুলিয়ে সে তন্ন তন্ন করে

খুঁজতে লাগল–যে মূর্তিমান আতঙ্ক এখনি এখানে এসে আবির্ভূত হবে! কিন্তু তার কোনও খোঁজই মিলল না!

আচ্ছা, বাঘ যদি এদিক না এসে অন্যদিকে যায়। কিন্তু যেদিকেই যাক, বাঘের ডাক তো আর সেতারের মিনমিনে আওয়াজ নয়, তার গর্জন আমি শুনতে পাবই। আর বাঘের বদলে যদি এদিকে আসে ভুলু-ডাকাতের দল, তাহলেও বড় মন্দ মজা হবে না–আর আধ মিনিট!

গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ করে আচম্বিতে ঝড় জেগে উঠে বটগাছটার ওপরে ভীষণ একটা ঝাঁপটা মারলে–পড়তে-পড়তে কুমার কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিলে।

ঠিক রাত বারোটা!

সঙ্গে সঙ্গে কান-ফাটানো এক ব্যাঘ্রের গর্জন! বাঘের ডাক যে এমন ভয়ানক আর অস্বাভাবিক হতে পারে, কুমারের সে ধারণাই ছিল না, তার সমস্ত শরীর যেন শিউরে শিউরে মুচ্ছিত হয়ে পড়বার মতো হল।

আবার সেই গর্জন–একবার, দুইবার, তিনবার! সে গর্জন শুনে ঝড়ও যেন ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল!

আকাশের কালো মেঘের বুক ছিঁড়ে ফালাফালা করে সুদীর্ঘ এক বিদ্যুতের লকলকে শিখা জ্বলে উঠল–

এবং নীচের দিকে তাকিয়ে কুমার স্পষ্ট দেখলে, প্রকাণ্ড একটা ব্যাঘ্র সামনের জঙ্গলের ভিতর থেকে তিরের মতো বেরিয়ে এল–

এবং অমনি তার বন্দুক ধ্রুম করে অগ্নিবৃষ্টি করলে!

–তার পরেই প্রথমে ব্যাঘ্রের গর্জন এবং সেই সঙ্গে মানুষের করুণ আর্তনাদ।

.

পাঁচ । মানুষ শিকার

বাঘের ডাক আর মানুষের আর্তনাদ থামতে না থামতেই সারি সারি লণ্ঠনের ও বিজলি মশালের (ইলেকট্রিক টর্চ) আলোতে চারিদিকের অন্ধকার যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল! ঝোপঝাপের ভিতর থেকে দলে দলে পুলিশের লোক গোলমাল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কুমারও তর তর করে গাছের ওপর থেকে নেমে এল। কিন্তু নেমে এসে গাছের নীচে চৌকিদারকে আর দেখতে পেলে না। নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনেই পৈত্রিক প্রাণটি হাতে করে সে চম্পট দিয়েছে।

মুখ তুলেই দেখে, চন্দ্রবাবু একহাতে রিভলভার আর এক হাতে বিজলি-মশাল নিয়ে ছুটতে ছুটতে তার দিকেই আসছেন।

কাছে এসেই চন্দ্রবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, কুমার, তুমিই কি বন্দুক ছুঁড়েছ?

কুমার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি, কিন্তু আর্তনাদ করে উঠল একজন মানুষ!

বাঘটাকে তুমি কোনখানে দেখছে!

খুব কাছেই। ওই যে, ওইখানে!

চন্দ্রবাবু সেইদিকে বিজলি-মশালের আলো ফেলে বললেন, কই, ওখানে তো বাঘের চিহ্নও নেই! কিন্তু মাটির ওপরে ওখানে কে বসে আছে?–দু-পা এগিয়েই তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন, আরে এ যে আমাদের পটলবাবু।

কুমার এগিয়ে গিয়ে দেখলে পটলবাবু মাটিতে বসে গায়ের চাদরখানা দিয়ে নিজের ডান পা-খানা বাঁধবার চেষ্টা করছেন।

চন্দ্রবাবু বললেন, এ কী পটলবাবু, আপনি এখানে কেন? আপনার পায়ে কি হয়েছে, চাদর জড়াচ্ছেন যে!

পটলবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বললেন, যে-জন্যে আপনারা এখানে, আমিও সেইজন্যেই এখানে এসে লুকিয়েছিলুম! কিন্তু ওই ভদ্রলোক যে গুলি করে আমায় একখানা পায়ের দফা একেবারে রফা করে দেবেন, তা তো আমি জানতুম না! গুলিটা যদি আমার মাথায় কি বুকে লাগত তাহলে কি হত বলুন দেখি?

কুমার অপ্রস্তুত স্বরে বললে, কিন্তু আমি যে স্বচক্ষে বাঘটাকে দেখেই বন্দুক ছুঁড়েছি। আপনার পায়ে কেমন করে গুলি লাগল কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

ক্রুদ্ধস্বরে পটলবাবু বললেন, বাঘকে দেখে বন্দুক ছুঁড়েছেন না, ঘোড়ার ডিম করেছেন। কাছেই কোথায় একটা বাঘ ডেকেছিল বটে, কিন্তু এখানটায় কোনও বাঘই আসেনি। এখানে বাঘ এলে আমি কি দেখতে পেতুম না? আপনি স্বপ্নে বাঘ দেখে আঁতকে উঠেছেন!

ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছ থেকে কে বলে উঠল, না, কুমারবাবু সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছেন-আমিও সজাগ হয়েই বাঘ দেখেছি! পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বাঘটা ঠিক ওইখানেই এসে দাঁড়িয়েছিল!

সকলে আশ্চর্য হয়ে উপরপানে তাকিয়ে দেখলে গাছের গুঁড়ি ধরে একজন লোক নীচে নেমে আসছে।

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বললেন, একি, মোহনলালবাবু যে! গাছের ওপরে চড়ে আপনি এতক্ষণ কী করছিলেন!

কুমারের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে মোহনলাল বললে, গাছে বসে ওই ভদ্রলোকেও যা করছিলেন, আমিও তাই করছিলুম। অর্থাৎ দেখছিলুম বিপদ কোনদিক দিয়ে আসে!

মোহনলালের বয়স হবে প্রায় চুয়াল্লিশ, মাথায় কাঁচা-পাকা বাবরি-কাটা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ ও ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, রং শ্যামবর্ণ, দেহখানি খুব লম্বা-চওড়া-দেখলেই বোঝা যায়, বয়সে প্রৌঢ় হলেও তার গায়ে রীতিমতো শক্তি আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, আপনি, বাঘের কথা কি বলছিলেন না?

মোহনলাল বললে, হ্যাঁ। পটলবাবু যেখানে বসে আছেন, বিদ্যুতের আলোতে ঠিক ওইখানেই আমি একটা মস্তবড় বাঘকে স্বচক্ষে দেখেছি। তার পরেই বন্দুকের আওয়াজ হল– সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বাঘের গর্জন আর মানুষের আর্তনাদ! তারপরে এখন দেখছি, এখানে বাঘের বদলে রয়েছেন পটলবাবু।

পটলবাবুর মরা-মানুষের চোখের মতো চোখদুটো হঠাৎ একবার জ্যান্ত হয়ে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তারপর তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, এখানে যে বাঘ-টাঘ আসেনি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছি আমি নিজে। বাঘটা এখানে এলে আমি এতক্ষণ জ্যান্ত থাকতুম না।

চন্দ্রবাবুও সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, পটলবাবুর এ যুক্তি মানতে হবে। আপনারা দুজনেই ভুল দেখেছেন!

পটলবাবু বললেন, দুজনে কেন, একশো জনে ভুল দেখলেও কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি বন্দুক ছোঁড়াটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।...এঃ, আমার ঠ্যাংখানার দফা একেবারে রফা হয়ে গেছে,উঃ! আমি যে আর উঠতেও পারছি না।

কুমার বেচারি একদম হতভম্বের মতন হয়ে গেল! সে যে বাঘটাকে দেখেছে। এবং তাকে দেখেই বন্দুক ছুড়ছে, এবিষয়ে তার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, অথচ অন্যের সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যে কোনও প্রমাণই তার হাতে নেই।

মোহনলাল একটা বিজলি মশাল নিয়ে মাটির ওপরে ফেলে বলে উঠল, এই দেখুন চন্দ্রবাবু বাঘ যে এখানে এসেছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ দেখুন। এই দেখুন, কাঁচামাটির ওপরে বাঘের থাবার দাগ। এই দেখুন, ওই ঝোপটার ভেতর থেকে থাবার দাগগুলো এইখানে এগিয়ে এসেছে!..কিন্তু কী আশ্চর্য! দেখুন চন্দ্রবাবু দেখুন!

চন্দ্রবাবুও বাঘের পায়ের দাগগুলো দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী ব্যাপার! পায়ের দাগ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাঘটা এদিক পানেই এসেছে বটে, কিন্তু সে যে এখান থেকে আবার ফিরে গেছে, পায়ের দাগ দেখে সেটা মনে হচ্ছে না তো!

আশেপাশে যে লোকগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তারা প্রত্যেকেই চমকে উঠল এবং সভয়ে বারংবার চারিদিকে তাকাতে লাগল কি জানি, বাঘটা যদি কাছেই কোনও জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

পটলবাবু বললেন, বন্দুকের শব্দ শুনেই বাঘটা হয়তো লম্বা একটা লাফ মেরে পাশের কোনও ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে কোনও বাঘ এসেছে বলে এখনও আমি মানতে রাজি নই,কারণ আমি নিজে কোনও বাঘ দেখিনি!

বাঘের পায়ের দাগগুলো আরও খানিকক্ষণ পরখ করে মোহনলাল বললে, না বাঘ যে এখানে এসেছিল, সেবিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই! এখান থেকে সবচেয়ে কাছের ঝোপ হচ্ছে অন্তত চল্লিশ হাত তফাতে। কোনও বাঘই একলাফে অতদূর গিয়ে পড়তে পারে না! কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘটা তবে গেল কোথায়?

পটলবাবু বললেন, সেকথা নিয়ে পরে অনেক মাথা ঘামাবার সময় পাবেন। আপাতত আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন দেখি,-আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই? এঃ, ঠ্যাং খানার দফা একেবারে রফা করে দিয়েছে দেখছি! কুমারবাবু মস্ত শিকারি আপনি! বাঘ মারতে এসে মারলেন কিনা মানুষকে! আর মানুষ বলে মানুষ-একেবারে আমাকেই।

লজ্জায়, অনুতাপে কুমার মাথা না হেঁট করে পারলে না।

মোহনলাল কোনও দিকেই না চেয়ে আপন মনে তখনও বাঘের পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত ছিল।

পটলবাবু টিটকারি দিয়ে বললেন, বাঘের পা থেকে ধুলোয় দাগ হয় বটে, কিন্তু সে দাগ থেকে আর আস্ত বাঘ জন্মায় না মোহনলালবাবু! মিছেই সময় নষ্ট করছেন!

মোহনলাল মাথা না তুলেই বললে, আমার যেন মনে হচ্ছে, এই বাঘের পায়ের দাগের ভেতর থেকেই আসল বাঘ আমাদের কাছে ধরা দেবে!

পটলবাবুর মরা চোখ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল–ক্ষণিকের জন্যে। তিনি বললেন, বলেন কি মশাই? দাগ থেকে জন্মাবে আস্ত বাঘ, এ কোন জাদুমন্ত্রে?

মোহনলাল বললে, যে জাদুমন্ত্রে মাটিতে পায়ের দাগ রেখে বাঘ শূন্যে উড়ে যায়!

চন্দ্রবাবু বললেন, কথাকাটাকাটি করে লাভ নেই। চলুন, পটলবাবু, আপনি জখম হয়েছেন, আপনাকে আমরা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে দূর থেকে সুতীক্ষ্ণ ফুটবল বাঁশির আওয়াজ শোনা গেল।

চন্দ্রবাবু সচমকে বলে উঠলেন, আমার গুপ্তচরের বাঁশি! সবাই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে পড়ো সবাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ো! শিগগির আলো নিভিয়ে দাও!

কুমার সুধোলে, ব্যাপার কী চন্দ্রবাবু? এ বাঁশির আওয়াজের মানে কি?

চন্দ্রবাবু বললেন, আমার গুপ্তচর বাঁশির সঙ্কেতে জানিয়ে দিলে যে, ভুলু-ডাকাতের দল এইদিকেই আসছে। তারা আসছে নিশ্চয় মোহনলালবাবুর বাড়ি লুঠ করতে?...কিন্তু মোহনলাল কোথায় গেলেন?..পটলবাবুই বা কোথায়?

মোহনলাল ও পটলবাবু দুজনেই একেবারে অদৃশ্য!

কুমার বললে, বোধ হয় ভুলু-ডাকাতের নাম শুনেই ভয়ে তারা চম্পট দিয়েছেন।

তাই হবে। এসো কুমার, আমরাও এই ঝোপটার ভেতরে গিয়ে অদৃশ্য হই–বলেই কুমারের হাত ধরে টেনে চন্দ্রবাবু পাশেই একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করলেন!

বিপদের ওপরে বিপদ! ঠিক সেই সময়ে আকাশের অন্ধকার মেঘগুলো যেন ছ্যাদা হয়ে গেল ঝুপঝুপ করে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরে নিরানন্দের মাত্রা যেন পূর্ণ করে তুললে।

চন্দ্রবাবু বললেন, কুমার, তোমার বন্দুকে টোটা পুরে নাও–এবারে আর বাঘ নয়, হয়তো আমাদের মানুষ শিকারই করতে হবে!

কুমার বললে, সে অভ্যাস আমার আছে। এর আগেও আমাকে মানুষ-শিকার করতে হয়েছে!

.

ছয় । কালো কালো হাত

সে কি বৃষ্টি!–ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, অন্ধকার শূন্যের ভিতর থেকে এক এক বিরাট প্রপাত হুড় হুড় করে জল ঢালছে আর ঢালছে।

চন্দ্রবাবু সঙ্গে কুমার যে-ঝোপটার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলে, সেটা ছিল ঢালু জমির উপরে। অল্পক্ষণ পরেই তাদের প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে কলকল আওয়াজে জলধারা ছুটতে লাগল।

চন্দ্রবাবু বিরক্তকণ্ঠে বললেন,–কপাল যাদের নেহাত পোড়া, তারাই পুলিশে চাকরি নেয়। শ্যাল কুকুররাও আজ বাইরে নেই, আমরা তাদেরও অধম!

কুমার তড়াক করে এক লাফ মেরে বললে, কী মুশকিল। সাপের মতন কি-একটা আমার গায়ের ওপর দিয়ে সাঁত করে চলে গেল!

খুব সাবধান কুমার! বর্ষাকাল সুন্দরবনে সাপের বড় উৎপাত! একটা ছোবল মারলেই ভবলীলা একেবারে সাঙ্গ!...দেখো, দেখো, ওই দেখো! মাঝে-মাঝে ইলেকট্রিক টর্চ জ্বালিয়ে কারা সব এই দিকেই আসছে! নিশ্চয়ই ভুলু-ডাকাতের দল!

কুমার বললে, ভুলু-ডাকাতকে আপনি কখনও দেখেছেন?

কেউ কোনওদিন তাকে দেখেনি। সে নিজে দলের সঙ্গে থাকে না। দলের সঙ্গে থাকে কালু-সর্দার, সে ভুলুর হুকুম মতো দলকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কালু-সর্দারকে আমি দেখেছি, সে যেন এক মাংসের পাহাড়, মানুষের দেহ যে তেমন বিপুল হতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতুম না। কালুর গায়ে জোরও তেমনি। শুনেছি, সে নাকি শুধু হাতে এক আছাড়ে একটা বাঘকে বধ করেছিল। একবার সে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রাত্রে বেলায় হাজত-ঘরের দেওয়াল থেকে একটা আস্ত জানলা উপড়ে ফেলে সে চম্পট দেয়।

চন্দ্রবাবুর কথা শুনতে-শুনতে কুমার দেখতে লাগল, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত তফাত দিয়ে ডাকাতদের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের কারুকে দেখা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু বিজলি মশালগুলোর আলো দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাদের গতি কোন দিকে!

চন্দ্রবাবু বললেন, দু-একটা আশ্চর্য রহস্যের কোনও কিনারাই আমি করতে পারছি না। ভুলু-ডাকাতদের দল ডাকাতি করতে বেরোয় কেবল অমাবস্যার রাত্রে। আর যে-অঞ্চলেই তার দল ডাকাতি করতে যায়, সেইখানেতেই বাঘের বিষম অত্যাচার হয়! বাঘের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই তারা যেন ডাকাতি করতে যায়। একবার একজন সাহেবগোয়েন্দা ভুলুকে ধরতে এসেছিল। কিন্তু শেষটা বাঘের কবলেই তার প্রাণ যায়। লোকের মুখে শুনি, বাঘই না কি ভুলুর ইস্টদেবতা, রোজ সে বাঘ-পুজো করে!

বাঘ-পুজো?

হ্যাঁ। সুন্দরবনে এটা কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই এখানে বাঘকে পুজো করে।

দেখুন, দেখুন! ডাকাতের দল অন্য দিকে যাচ্ছে।

হু, ওই দিকেই মোহনলালের বাসায় যাবার পথ। ওরা যে মোহনলালের বাসার দিকেই যাবে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। পটলবাবুর সন্দেহ ভুল-মোহনলাল যদি ভুলুর দলের লোক হত, তাহলে ডাকাতরা কখনওই তার বাড়ি লুট করতে আসত না।

কুমার বললে, এখন আপনি কি করবেন?

পকেট থেকে একটা বাঁশি বার করে চন্দ্রবাবু বললেন, এইভাবে আমি বাঁশি বাজাব। ডাকাতরা জানে না, ওরা আজ কী ফাঁদে পা দিয়েছে! আমি বাঁশি বাজালেই আমার দলের লোকেরা ওদের ঘেরাও করে ফেলবে। কুমার প্রস্তুত হও!-চন্দ্রবাবু বাঁশি বাজাতে উদ্যত হলেন।

সেই মুহূর্তেই তীব্র স্বরে একটা ফুটবল বাঁশি বেজে উঠল কিন্তু সে চন্দ্রবাবুর বাঁশি নয়!...ডাকাতদের বিজলি মশালগুলো এক পলকে নিবে গেল?

চন্দ্রবাবু এক লাফে ঝোপের বাইরে এসে বললেন, ও বাঁশি কে বাজালে? ডাকাতদের কে সাবধান করে দিলে?-বলতে-বলতে তিনিও বাঁশিতে ফুঁ দিলেন-একবার, দুবার, তিনবার।

জঙ্গলের চারিদিকে পুলিশের লণ্ঠন জ্বলে উঠল, চারিধারে ঝোপঝাপ থেকে দলে-দলে পুলিশের লোক বেরিয়ে এল,-তাদের কারুর হাতে বন্দুক, কারুর হাতে লাঠি।

চন্দ্রবাবু চিৎকার করে বললেন, ডাকাতরা পালাচ্ছে, ওদের আক্রমণ করো! ওইদিকে-ওইদিকে-শিগগির। চন্দ্রবাবু ও কুমার রিভলভার ও বন্দুক ছুঁড়তে-ছুঁড়তে ডাকাতরা যেদিকে ছিল সেইদিকে ছুটতে লাগলেন!

কিন্তু যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে চন্দ্রবাবু ডাকাতদের কারুর টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেলেন না! দারুণ বৃষ্টিতে মাটির ওপর দিয়ে যেন বন্যা ছুটছে, এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ায় বন-জঙ্গল উজ্জ্বল ভাবে দুলছে, বিজলির মশালের সীমানার বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে, এর মধ্যে ডাকাতরা যে কোথায়, কোনওদিকে গা ঢাকা দিয়েছে তা স্থির করা অসম্ভব বললেই চলে।

চন্দ্রবাবু হতাশভাবে বললেন, নাঃ, আজও খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল দেখছি। কিন্তু কোন রাস্কেল বাঁশি বাজিয়ে তাদের সাবধান করে দিলে, সেটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

কুমার বললে, বোধহয়, ডাকাতদের কোনও চর বনের ভেতরে লুকিয়ে থেকে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করছিল!

সম্ভব। কিন্তু আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, আমরা চন্দ্রবাবু কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ পাশের জঙ্গলের ভিতর থেকেই দুখানা বড় বড় কালো হাত বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে এল এবং পরমুহূর্তে তারা কুমারকে ধরে শূন্যে তুলে নিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, কুমার একটা চিৎকার করবার অবসর পর্যন্ত পেলে না! বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে কুমার নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, সঙ্গে সঙ্গে সেই মহা-বলবান অজ্ঞাত শত্রু তার দেহ ধরে এমন এক প্রচণ্ড আঁকানি দিলে যে, তার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল।

.

সাত । বাঘের গর্তে

নীচে কল কল করে জলের বন্যা ছুটে চলেছে, উপরেও ঝড়ের তোড়ে নিবিড় গাছপালার ভিতর দিয়ে যেন শব্দের বন্যা ডেকে ডেকে উঠছে এবং এ সমস্তকেই গ্রাস করে নীরবে বয়ে যাচ্ছে যেন অন্ধকারের বন্যা!

এরই মধ্যে কুমার কখন জ্ঞান ফিরে পেলে।

অনুভবে বুঝলে, তার দেহটা দুমড়ে কার কাঁধের ওপরে পড়ে রয়েছে।

সে একটু নড়বার চেষ্টা করতেই একখানা লোহার মতো শক্ত হাতে তাকে টিপে ধরে কে কর্কশ স্বরে বললে, চুপ। ছটফট করলেই টুটি টিপে মেরে ফেলব! তার হাতের চাপেই কুমারের কোমরটা বিষম ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল!

ভীমের মতন গায়ের জোর,-কে এই ব্যক্তি? কাঁধে করে কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে? কুমারের ইচ্ছা হল, তার মুখখানা একবার দেখে নেয়। কিন্তু যা ঘুটঘুটে অন্ধকার!

পায়ের শব্দে বুঝলে, তার আশেপাশে আরও অনেক লোক আছে। কে এরা? ভুলু ডাকাতের দল? কিন্তু এত লোক থাকতে এরা তাকে বন্দি করল কেন? তাকে নিয়ে এরা কি করতে চায়?

অন্ধকারের ভিতর থেকে কে বললে, বাপরে বাপ, এত অন্ধকার তো কখনও দেখিনি! পথ চলা যে দায় হয়ে উঠল, আলো জ্বালব নাকি?

যে তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে বললে, খর্বদার নিশে, আলো জ্বালাবার নাম মুখেও আনিস নে! পুলিশের লোক যদি পিছু নিয়ে থাকে তাহলে আলো জ্বাললেই ধরা পড়বি! তার ওপরে এই ছোকরাকে আমি আমার মুখ দেখাতে চাই না!

আর একজন বললে, ওকে মুখই বা দেখাব কেন, আর অমন করে বয়েই বা মরছ কেন? দাওনা এক আছাড়ে সাবাড় করে।

ভোঁদা ব্যাটার বাপ ছেলের ঠিক নামই রেখেছিল। ভোদানইলে অমন বুদ্ধি হয়? ওরে গাধা, আমি কি শখ করে এ ছোঁড়াটাকে ঘাড়ে করে বয়ে মরছি?

ওকে নিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে?

ওরে ব্যাটা ভোঁদা, তোর চেয়ে ভোঁদড়ও চালাক দেখছি। এ ছোঁড়াকে নিয়ে কি করব, এতক্ষণে তাও বুঝিসনি? শোন তবে? আপাতত এ ছোঁড়া আমাদের আড্ডায় বন্দি থাকবে। আসছে অমাবস্যার ডাকাতি করতে বেরুবার আগে মা কালীর সামনে একে বলি দেব। মা বোধ হয় আমাদের ওপর রেগেছেন। তিনি মুখ ফিরিয়েছেন বলেই এ-যাত্রা আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল। এমন তো কখনও হয় না। মা নিশ্চয় নরবলি চান।

লোকটার মুখের কথা শেষ হতে না-হতেই ভীষণ এক ব্যাঘ্রের গর্জনে আকাশের মেঘ আর অরণ্যের অন্ধকার যেন থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ–বারবার তিনবার! তার পরেই সব চুপচাপ!

মহা-আতঙ্কে কম্পিত কণ্ঠে কে বললে, সর্দার!

হু!

বাঘ!

না, আমাদের মা বাঘাইচণ্ডী! বললুম তো, মায়ের খিদে পেয়েছে, মা নরবলি চান। তোরা মাকে খেতে দিলিনে, মা তাই নিজেই খিদে মেটাতে এসেছে।

কিন্তু মা যে আমাদেরই কাকে ধরে নিয়ে গেলেন! এ কীরকম মা নিজের পেটের ছেলেকেই পেটে পুরবেন?

খিদের সময়ে আত্মপর জ্ঞান থাকে না রে ভোদা, আত্মপর জ্ঞান থাকে না। আর কে-ই বা মায়ের ছেলে নয়–মা তো জগৎ জননী, সবাই তো মায়ের ছেলে।

কুমার চুপ করে সব কথা শুনে যাচ্ছিল। নিজের পরিণামের কথাও শুনলে। বলির পশুর মতন তাকে মরতে হবে! তার মনটা যে খুব খুশি হয়ে উঠল না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সর্দার বলে যাকে ডাকা হচ্ছে, তাকে যে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে এই লোকটা? এই-ই কি ভুলু-ডাকাত? না তার প্রধান অনুচর কালু-সর্দার?

হঠাৎ বিমলের কথা তার মনে হল! সে এখন কলকাতায়। তার বন্ধু যে আজ মরণের পথে এগিয়ে চলেছে একথা সে জানেও না। কুমারের মনে এখন অনুতাপ হতে লাগল, কেন সে বিমলের জন্যে অপেক্ষা করেনি? কেন সে একলা এই বিপদের রাজ্যে এল? বিমল যদি আজ এখানে থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই সে প্রাণপণে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করত– আর খুব সম্ভব তাকে উদ্ধার করতে পারতও হয়তো

আচম্বিতে কি যে হল, কেবল এইটুকুই তার মনে হল, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হুস করে সে নীচের দিকে নেমে গেল, তার পরেই ঝপাং করে একটা শব্দ সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে, সে আর মাটির ওপরে নেই, জলের ভিতরে গিয়ে পড়েছে।

একেবারে এক গলা জল? যে লোকটার কাঁধে চড়ে এতক্ষণ সে যাচ্ছিল, সেও এখন জলের মধ্যে!...নিজেকে সামলে নিয়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তার সঙ্গের লোকটা একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

উপরপানে তাকিয়ে দেখলে খালি ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

আবার চারিদিক হাতড়ে হাতড়ে সে বুঝলে, তারা একটা গভীর গর্তের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের বাসিন্দারা বাঘ ধরবার জন্যে বনের মাঝে-মাঝে গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখটা ঘাস-পাতা-গাছপালা দিয়ে ঢেকে রাখে। এটা নিশ্চয়ই সেইরকম কোনও গর্ত।

কুমার কান পেতে শুনতে লাগল। ডাকাতদের কোনও সাড়াশব্দ নেই। তাদের সর্দার যে মা-বাঘাইচণ্ডীর বলি নিয়ে গর্তের মধ্যে কুপোকাত, একথা নিশ্চয়ই তারা বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে অন্ধ হয়ে নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে গিয়েছে!

কিন্তু একটু পরেই তো তারা নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারবে। তখন আবার তারা সদলবলে ফিরে আসবে।

যদি পালাতে হয় তো এই হচ্ছে পালাবার সময়।

কিন্তু চারিদিককার দেওয়ালে হাত বুলিয়ে কুমার বুঝলে দেওয়াল খাড়া ভাবে ওপরে উঠেছে সাপ আর টিকটিকি না হলে তা বয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব।

সে হতাশ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ ওপরে কার দ্রুত পায়ের শব্দ হল,–মাত্র একজনের পায়ের শব্দ!

কে এ? ডাকাতরা কি আবার ফিরে এল? কিন্তু তারা এলে তো দল বেঁধে ফিরে আসবে।

তবে কি এ পুলিশের চর? ডাকাতদের পিছু নিয়েছে?

যা থাকে কপালে–এই ভেবে কুমার চেঁচিয়ে ডাকলে, কে যায়? আমি গর্তের ভেতরে পড়ে গেছি, আমাকে বাঁচাও!

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কুমার আবার চেঁচিয়ে বললে, আমি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছি আমাকে বাঁচাও!

তখনও জবাব নেই।

কিন্তু হঠাৎ কুমারের মুখের ওপরে কি একটা এসে পড়ল, ঠিক একটা সাপের মতো।

কুমার সভয়ে চমকে উঠল–কিন্তু তার পরেই বুঝলে, ওপর থেকে গর্তের ভিতরে এক গোছ মোটা দড়ি ঝুলছে!

কুমার বিস্মিত হবারও অবকাশ পেলে না–তাড়াতাড়ি দড়িগাছা চেপে ধরতেই ওপর থেকে কে তাকে টেনে তুলতে লাগল!

পাতাল ছেড়ে পৃথিবীর ওপরে এসে দড়ি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে কুমার উল্লসিত কণ্ঠে বললে, কে তুমি ভাই, আমাকে যমের মুখ থেকে বাঁচালে?

কাউকে দেখা গেল না–খালি অন্ধকার! কোনও জবাব এল না–খালি শোনা গেল কার দ্রুত পায়ের শব্দ! কে যেন সেখান থেকে চলে গেল! যেন ভৌতিক কাণ্ড!

কে এই অজ্ঞাত ব্যক্তি? কেন সে তার সঙ্গে কথা কইলে না, কেন সে পরিচয় দিলে না, কেন সে তাকে বাঁচিয়ে এমন করে পালিয়ে গেল? এ কী আশ্চর্য রহস্য!

খানিক তফাত থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল।...ডাকাতরা ফিরে আসছে। তারা বুঝতে পেরেছে, সর্দার আর তাদের দলে নেই।

কুমার বেগে অন্য দিকে দৌড় দিল।

.

আট । পটলবাবুর বাড়ি

অমাবস্যার রাতের সেই রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের পর কুমারের গায়ের ব্যথা মরতে গেল, এক হপ্তারও বেশি।

সেদিন সকালবেলায় থানার সামনের মাঠে পায়চারি করতে করতে কুমার নানান কথা ভাবছিল।

নানান ভাবনার মধ্যে তার সবচেয়ে বড় ভাবনা হচ্ছে, বাঘের গর্তের ভিতর থেকে যে তাকে সেদিন উদ্ধার করলে, কে সেই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই সে ডাকাতদের দলের কেউ নয়। গাঁয়ের ভিতরেও কুমারের এমন কোনও বন্ধু নেই (একমাত্র চন্দ্রবাবু ছাড়া) তার জন্যে যার এতটা মাথাব্যথা হবে! এই রহস্যময় ব্যক্তি তার প্রাণরক্ষা করলে, অথচ তাকে দেখাই বা দিলে না কেন?

সে রাতের সব ব্যাপারের সঙ্গেই গভীর রহস্যের যোগ আছে। সে স্বচক্ষে বাঘ দেখলে, বন্দুক ছুড়লে, অথচ জখম হলেন পটলবাবু। বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে, অথচ পটলবাবু বলেন, সেখানে বাঘ আসেনি।

কুমার মনে-মনে এমনি সব নাড়াচাড়া করছে, এমন সময়ে দেখতে পেলে, পথ দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলছে মোহনলাল।

মোহনলালও তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, এই যে কুমারবাবু নমস্কার! শুনলুম আপনি নাকি মস্ত বিপদে পড়েছিলেন?

হ্যাঁ। কিন্তু যেমন হঠাৎ বিপদে পড়েছিলুম, তেমনি হঠাৎ উদ্ধারও পেয়েছি!

মোহনলাল বললে, আমি বরাবরই দেখে আসছি কুমারবাবু বিপদের যারা তোয়াক্কা রাখে না, বিপদও যেন তাদের এড়িয়ে চলে।

কুমার একটু হেসে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্তত আমার জীবনে বারবার তাই-ই হয়েছে। বটে!... কিন্তু এত সকালে আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

মোহনলাল বললে, একবার পটলবাবুকে দেখতে যাচ্ছি। সেদিন আর একটু হলেই তো পটলবাবু আপনার হাতেই পটল তুলেছিলেন, নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই বেচারি এ যাত্রা বেঁচে গেলেন! ভদ্রলোক কেমন আছেন সেই খোঁজ নিতেই চলেছি।

কুমার লজ্জিত ভাবে বললে, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গী হব। আমার জন্যেই তাঁর এই দুর্দশা, তার খবর নেওয়া আমার কর্তব্য।

মোহনলালের সঙ্গে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে কুমার শুধোলে, আচ্ছা মোহনবাবু, সেদিন যে আমি সত্যি-সত্যিই বাঘ দেখে বন্দুক ছুঁড়েছি, এবিষয়ে আপনার কোনও সন্দেহ আছে কি?

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে মোহনলাল বললে, একটুও না–একটুও না। তার প্রমাণও দেখুন– বলেই সে পকেট থেকে কাগজের ছোট এক মোড়ক বার করলে।

মোড়কের ভিতরে রয়েছে একগোছা লোম। বাঘের লোম।

কুমার বিস্মিত ভাবে বললে, এ লোম আপনি কোথায় পেলেন?

আপনার গুলি খেয়ে পটলবাবু যেখানে পড়ে ছটফট করছিলেন, সেইখানে।

লোমগুলোতে এখনও শুকনো রক্তও লেগে রয়েছে দেখছি।

হ্যাঁ, এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনার গুলি বাঘের গায়েও লেগেছে!

কুমার বললে, তা না হতেও পারে। হয়তো পটলবাবুর আহত পায়ের রক্তই লোমগুলোতে লেগে আছে।

কুমারবাবু, এ মানুষের রক্ত নয়।

কি করে জানলেন আপনি?

মোহনলাল গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

পরীক্ষা? শুকনো রক্তের দাগ কি লেখা থাকে যে তা মানুষ না পশুর রক্ত?

থাকে কুমারবাবু, থাকে। আপনি কি Bordet Reaction-এর কথা **শোনেননি**? Bordet সাহেব একরকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে শুকনো রক্তের দাগ পেলেই বলে দেওয়া যায়, তা মানুষ কি পশুর রক্ত!

আর সে-পদ্ধতি আপনি জানেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই পদ্ধতিতেই পরীক্ষা করে বুঝেছি, এ রক্ত মানুষের রক্ত নয়।

কুমার বিস্ময়ে ও নিজের অজ্ঞতায় নির্বাক হয়ে রইল। তার চোখে মোহনলাল আজ নতুন রূপে ধরা দিলে। সে বেশ বুঝলে, এ ব্যক্তি তো সাধারণ লোক নয়–নিশ্চয়ই এ অনেক ব্যাপারই জানে এবং বোঝে; এবং এ যে এখানে এসেছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনও গূঢ় কারণ আছে!

খানিকক্ষণ পরে কুমার বললে, বাঘের ডাক শুনলুম, তাকে দেখলুম, গুলি করলুম, সে আহত হল, তার রক্তও পাওয়া গেল, কিন্তু তারপর? কর্পূরের মতো বাঘ কোথায় উবে গেল?

মোহনলাল চিন্তিত মুখে বললে, সেইটেই তো হচ্ছে আসল প্রশ্ন! একটা মস্ত বাঘ তার আস্ত দেহ নিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়?

আর তার সেই খোঁড়া ঠ্যাং নিয়ে পটলবাবুই বা চোখের নিমিষে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কেমন করে?

হো হো করে হেসে উঠে মোহনলাল বললে, প্রাণের দায়ে অসম্ভবও সম্ভব হয়, কচ্ছপও দৌড়ে হরিণকে হারিয়ে দিতে পারে!...তবে পটলবাবু হয়তো ডাকাতদের ভয়ে পিঠটান দেননি।

তবে?

আপনার ভয়েই তিনি বোধ হয় একটি মাত্র ঠ্যাংয়ে ভর দিয়েই লম্বা দিয়েছিলেন।

আমার ভয়ে?

হ্যাঁ। আপনার লক্ষ্যভেদ করবার শক্তির ওপরে হয়তো তার মোটেই বিশ্বাস নেই। একবার বাঘ বধ করতে গিয়ে মারতে গিয়ে পা খোঁড়া করে দিয়েছিলেন, তারপর আবার ডাকাত মারতে গিয়ে আপনি যে তারই প্রাণপাখিকে খাঁচাছাড়া করতেন না, সেটা তিনি ভাবতে

পারেননি। কাজে কাজেই যঃ পলায়তি স জীবতি! পটলবাবু বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন।

কুমার অপ্রতিভ হয়ে হেঁট করলে।

মোহনলাল তারপর যেন নিজের মনে মনেই বললে, কিন্তু এ কীরকম কথা? বাঘের গায়ে লাগল গুলি, বাঘ হল জখম, তবে পটলবাবুর পা কেমন করে খোঁড়া হল?

তাই তো, এ কথাটা তো কুমার এতক্ষণ ভেবে দেখেনি। এও বা কেমন করে সম্ভব হয়?

এখানকার সমস্ত কাণ্ডই যেন আজগুবি, এ বিপুল রহস্যের সমুদ্রে যেন কিছুতেই থই পাবার যো নেই।

তারা পটলবাবুর বাড়ির সুমুখে এসে হাজির হল।

পটলবাবুকে প্রথম দেখে কুমারের যেমন মনে হয়েছিল শ্মশানের চিতার আগুনের ভিতর থেকে একটা মড়া যেন দানোয় পেয়ে জ্যান্ত পৃথিবীর পানে মিটমিট করে তাকিয়ে দেখছে, তেমনি পটলবাবুর বাড়িখানাকেও দেখে কুমারের মনে হল–এ যেন কার বিজন সমাধিভবন।

চারিধারে ঝোপঝাপ, ঘন বাঁশঝাড়, পোড়ো জমি; এক কোণে একটা পচা ডোবা; মাঝখানে একটা পানা-ধরা পুকুর–এক সময়ে তার সব দিকেই বাঁধানো ঘাট ছিল এখন তার একটাও টিকে নেই। সেই পুকুরেরই পূর্বদিকে পটলবাবুর জীর্ণ, পুরোনো ও প্রকাণ্ড বাড়িখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভাবছে, এইবারে কবে সে একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। এ-বাড়িকে কেবল বাড়ি বললেই ঠিক বলা হবে না, একে অট্টালিকা বলাই উচিত সাত-মহলা অট্টালিকা! কিন্তু তার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চোখ চালিয়ে; খালি দেখা যায়, লোনা ধরা, ক্ষয়ে যাওয়া, বালি-খসা ইটগুলো যেন ছাল ওঠা ঘায়ের মতন লাল হয়ে আছে! অজগর সাপের মতন শিকড় দিয়ে দেওয়ালকে জড়িয়ে বড় বড়

সব গাছ হাওয়ার ছোঁয়ায় শিউরে আর্তনাদ করে উঠছে,–এক একটা গাছ এত বড় যে, তার ডাল বয়ে আট-দশজন মানুষ উঠলেও তারা নুয়ে পড়বে না!

কুমার সবিস্ময়ে বললে; এ তো বাড়ি নয়, এ যে শহর। পটলবাবুর পূর্বপুরুষরা নিশ্চয়ই খুব ধনী ছিলেন?

মোহনলাল বললে, জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, এ-বাড়ি পটলবাবুর পূর্বপুরুষের নয়। পটলবাবু এ-গাঁয়ে এসে বাসা বেঁধেছেন মোটে তিন বছর। এই পোড়া বাড়ি আর জমি। তিনি জলের দরে কিনে নিয়েছেন।

বাড়িখানাকে কিনে এর এমন অবস্থা করে রেখেছেন কেন?

এত বড় বাড়ি মেরামত করতে গেলেও কত হাজার টাকার দরকার, তা কি বুঝতে পারছেন না? বাড়িখানার একটা মহলই পটলবাবুর পক্ষে যথেষ্ট। সেই অংশটুকু মেরামত করে নিয়ে পটলবাবু সেইখানেই থাকেন।

কিন্তু এ-বাড়ি আগে কার ছিল, আপনি কি তা জানেন?

সে খোঁজও আমি নিয়েছি। বাংলাদেশের অনেক বড় জমিদারের পূর্বপুরুষ ডাকাত ছিলেন। প্রায় তিনশো বছর আগে এমনি এক ডাকাত-জমিদার এই বাড়িখানা তৈরি করিয়েছিলেন। এরকম সেকেলে বাড়ির ভেতরে অনেক রহস্য থাকে। আমরা খোঁজ নিলে আজও তার কিছু কিছু পরিচয় পেতে পারি।

বাড়ির সদর দরজা এমন মস্ত যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতি ঢুকতে পারে। এতকাল পরেও দরজার লোহার খিল মারা পুরু পাল্লা দুখানা একটুও জীর্ণ হয়ে পড়েনি।

মোহনলালের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকে কুমার বললে, পটলবাবু কোন অংশে থাকেন; আপনি জানেন তো?

জানি কিন্তু তার আগে বাড়ির অন্য অন্য মহলগুলো একবার বেড়িয়ে এলে আপনার কষ্ট হবে কি?

কুমার পরম উৎসাহিত হয়ে বললে, কিছু না কিছু না! বলতে কি, আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম। কিন্তু পটলবাবুকে আগে তো সেটা একবার জানানো দরকার?

কোনও দরকার নেই; পটলবাবুর মহল একেবারে আলাদা তার দরজাও অন্য দিকে। এ মহলগুলোয় জনপ্রাণী বাস করে না, এগুলো এমনি খোলাই পড়ে থাকে, এর মধ্যে যে কেউ ঢুকতে পারে কত শেয়াল কুকুর আর সাপ-খোপ যে এর ভেতর বাসা বেঁধে আছে, কে তা বলতে পারে?

একে-একে তারা তিন-চারটে মহল পার হল–বাড়ির ভিতরের অবস্থাও তথৈবচ। বড় বড় উঠান, দালান, চক মিলানো ঘর, কারুকাজ করা খিলান, কার্নিশ, থাম ও দরজা কিন্তু বহুকালের অযত্নে আর কোথাও কোনও শ্রী নেই। ঘরে ঘরে বাদুড় দুলছে, চামচিকে উড়ছে, কোলা ব্যাং লাফাচ্ছে, পথ দিয়ে চলতে গেলে জংলা গাছপালা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা দেয়, ঘুমন্ত সাপ-জোগ রেগে ফোঁশ করে ওঠে, তফাতে-তফাতে পলাতক জানোয়ারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়।

মাঝে মাঝে সব অলিগলি, শুড়িপথ–তাদের ভিতরে কষ্টিপাথরের মতন জমাট বাধা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, সেই সব অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে যেন ভীষণ সব চোখের আগুন জ্বলে-জ্বলে উঠছে,-সে হিংসুক, ক্ষুধিত দৃষ্টিগুলো যেন মানুষের রক্তপান করবার জন্যে দিবারাত্র সেখানে জাগ্রত হয়ে আছে!..আর সে কী স্তব্ধতা! সে স্তব্ধতাকে যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়।

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, দেখুন মোহনবাবু, মাটির দিকে চেয়ে দেখুন!

মাটির পানে তাকিয়েই একটি লাফ মেরে মোহনলাল বলে উঠল অ্যাঃ! আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি যে, এটা দেখতে না পেয়ে বোকার মতন এগিয়ে চলেছি! ভাগ্যিস আপনি দেখতে পেলেন! বলেই সে আগ্রহ-ভরে মাটির ওপরে হেঁট হয়ে পড়ল।

মাটির ওপর দিয়ে বরাবর এগিয়ে চলেছে বাঘের বড় বড় থাবার চিহ্ন!

সেই পায়ের দাগ ধরে অগ্রসর হয়ে মোহনলাল ও কুমার গিয়ে দাঁড়াল একটা শুঁড়িপথের সামনে। সেখানে আবার নতুন ও পুরাতন অসংখ্য পায়ের দাগ–দেখলেই বেশ বোঝা যায়, ব্যাঘ্র মহাশয় সেখানে প্রায়ই বেড়াতে আসেন।

মোহনলাল বললে, পটলবাবুর এই রাজপ্রাসাদে যে এত বেশি বাঘের আনাগোনা, গাঁয়ের কেউ তো সে খবর জানে না।

চিড়িয়াখানার বাঘদের ঘরে যেরকম দুর্গন্ধ হয়, শুড়িপথের গাঢ় অন্ধকারের ভিতর থেকে ঠিক সেইরকম একটা বিশ্রী, বোঁটকা গন্ধ বাইরে বেরিয়ে আসছে!

মোহনলাল একবার সেই ভয়াবহ শুড়িপথের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর ফিরে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললে, কুমারবাবু, এর ভেতরে ঢোকবার সাহস আপনার আছে?

কুমার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

তাহলে আমার সঙ্গে আসুন বলেই মোহনলাল বিনা দ্বিধায় সেই অন্ধকারে অদৃশ্য বিপদ ও রহস্যেপূর্ণ শুড়িপথের ভিতরে প্রবেশ করল এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে এগুলো কুমার–অটল পদে, নির্ভীক প্রাণে।

.

নয়। মরণের সামনে

মোহনলাল যে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান ওরহস্যময় ব্যক্তি, আজকে তার সঙ্গে ভালো করে কথা কয়ে কুমার এটা তো বেশ বুঝতে পারলেন, তার ওপরে বুকের পাটা দেখে সে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কুমার আর একজন মাত্র লোককে জানে, এরকম মরিয়ার মতো সে এমনই মৃত্যুভয় ভরা অজানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভালোবাসে। সে হচ্ছে তার বন্ধু বিমল। ছেলেবেলা থেকেই বিপদের পাঠশালায় সে মানুষ।

কিন্তু মোহনলাল কেন যে যেচে এই মৃত্যু-খেলায় যোগ দিয়েছে, কুমার সেটা কিছুতেই আন্দাজ করতে পারছে না। সেও কি তাদেরই মতন শখ করে নিরাপদ বিছানার আরাম ছেড়ে চারিদিকে বিপদকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, না নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই অমাবস্যার রাতের এই ভীষণ গুপ্তকথাটা সে জানতে চায়?

কিন্তু এখন এসব কথা ভাববার সময় নয়। কী ভয়ানক শুড়িপথ এ? কয়েক পা এগিয়েই কুমার দেখলে গলির মুখ দিয়ে বাইরের একটুখানি যে আলোর আভা আসছিল, তাও অদৃশ্য হয়ে গেছে! এখন খালি অন্ধকার আর অন্ধকার–সে নিবিড় অন্ধকারের প্রাচীর ঠেলে কোনও মানুষের চোখই কোনওদিকে অগ্রসর হতে পারে না।

শুঁড়িপথের দুদিকের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল এত বেশি স্যাঁতসেঁতে যে, হাত দিতেই কুমারের হাত ভিজে গেল! আর সেই জানোয়ারি বোঁটকা গন্ধ! নাকে খুব কষে কাপড়-চাপা দিয়েও কুমারের মনে হতে লাগল, তার পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত আজ বোধ হয় উঠে আসবে।

মোহনলালের হাতে, সেই অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে হঠাৎ একটা ছোট ইলেকট্রিক লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠল। কুমার বুঝলে, মোহনলাল রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

মোহনলাল বললে, কুমারবাবু, আপনার কাছে কোন অস্ত্র-টস্ত্র আছে?

না।

আপনি দেখছি আমার চেয়েও সাহসী! নিরস্ত্র হয়ে এই ভীষণ স্থানে ঢুকতে ভয় পেলেন না?

আপনিও তো এখানে ঢুকেছেন, আপনিও তো বড় কম সাহসী নন!

কিন্তু আমার কাছে রিভলভার আছে। বলেই মোহনলাল ফস করে হাতের আলোটা নিবিয়ে ফেললে।

ও কি আলো নেবালেন কেন?

একবার খালি দেখে নিলুম, পথটা কীরকম। অজানা পথ না হলে এখানে আলো জ্বালতুম না–শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ কি?

শত্রু?

হ্যাঁ। এই পথের মাটির ওপরে আলো ফেলে এই মাত্র দেখলুম যে, এখানে খালি বাঘের পায়ের দাগই নেই, মানুষের পায়ের দাগ রয়েছে।

একসঙ্গে বাঘের আর মানুষের পায়ের দাগ? বলেন কি!

চুপ। আর কথা নয়! হয়তো কেউ আমাদের কথা কান পেতে শুনছে!

অত্যন্ত সতর্কভাবে পা টিপে টিপে দুজনে এগুতে লাগল–অন্ধকার যেন হাজার হাত বাড়িয়ে ক্রমেই বেশি করে তাদের চেপে ধরছে, বদ্ধ-বাতাস দুর্গন্ধে যেন ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠছে, কি একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক যেন তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে দেবার জন্যে চেষ্টা করছে। কুমারের মনে হল, সে যেন পৃথিবী ছেড়ে কোনও ভূতুড়ে জগতের ভিতরে প্রবেশ করছে- এ পথ যেন যমালয়ের পথ, প্রেতাত্মা ছাড়া আর কেউ যেন এ-পথে কোনওদিন পথিক হয়নি!

আচম্বিতে মাথার ওপর দিয়ে বদ্ধ-বাতাসের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়ার চঞ্চল তরঙ্গ তুলে ঝটপট করে কারা সব চলে গেল! সমাধির নিঃশব্দতার মধ্যে হঠাৎ সেই শব্দ শুনে কুমারের বুকের কাছটা ধড়ফড়িয়ে উঠল, কিন্তু তার পরেই বুঝলে, এই মৃত জগতে জীবন্তের সাড়া পেয়ে বাদুড়েরা দলে দলে পালাচ্ছে!

আরও কিছুদূর এগিয়েই মোহনলাল চুপিচুপি বললে, এখানে একটা দরজা আছে বোধ হয় বলেই সে আবার এগিয়ে গেল।

অন্ধকারে হাত বুলিয়ে কুমারও বুঝলে, দরজাই বটে! তার পাল্লা দুটো খোলা। সেও চৌকাঠ পার হয়ে গেল। তারপর দুদিকে হাত বাড়িয়েও আর দেওয়াল খুঁজে পেলে না। শুড়িপথ তা হলে শেষ হয়েছে।

কিন্তু তারা কোথায় এসেছে? এটা ঘর, না অন্য কিছু? এখানেও দুর্গন্ধের অভাব নেই, উপর-পানে চাইলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না কিন্তু কুমার অনুভব করলে যে শুড়ি পথের থমথমে বদ্ধ-বাতাস আর এখানে স্তম্ভিত হয়ে নেই।

তারা দুজনেই সেখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে খানিকক্ষণ কান পেতে রইল এবং অন্ধকারের মধ্যে দেখবার কোনও কিছু খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছু দেখাও যায় না, কিছু শোনাও যায় না। যেন দেহশূন্য মৃতের রাজ্য!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মোহনলাল আবার তার ইলেকট্রিক লণ্ঠনটা জ্বাললে।

এটা প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মতো, কিন্তু এটা ঘর নয়, কারণ ঘর বলতে যা বোঝায়, এ জায়গাটাকে তা বলা যায় না। এটা একটা প্রকাণ্ড উঠানের চেয়েও বড় জায়গা, কিন্তু মাথার ওপরে রয়েছে ছাদ। মাঝে মাঝে থামছাদের ভার রয়েছে তাদের ওপরেই।

হঠাৎ মোহনলাল সবিস্ময়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে উঠল! তার পরেই কুমারের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, দেখুন কুমারবাবু, দেখুন!

কী ভয়ানক!...কুমার রুদ্ধশ্বাস আড়ষ্ট নেত্রে দেখলে, তাদের কাছ থেকে হাত দশেক তফাতেই পড়ে রয়েছে একটা মড়ার মাথা। এবং সেই মাথাটার পাশে মাটির ওপরে এলানো রয়েছে স্ত্রীলোকের মাথার একরাশি কালো চুল।

খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে, একটা নিশ্বাস ফেলে মোহনলাল বললে, ওই মড়ার মাথা থেকেই ও চুলগুলো খসে পড়েছে। ও-মাথাটা নিশ্চয়ই কোনও স্ত্রীলোকের।

কুমার বললে, হ্যাঁ। এখনও ও-মাথাটার আশে-পাশে কিছু কিছু চুল লেগে রয়েছে। যার ওই মাথা, নিশ্চয়ই সে বেশিদিন মরেনি।

মোহনলাল দুঃখিত স্বরে বললে, অভাগীর মৃত্যু হয়েছে হয়তো কোনও অমাবস্যার রাতেই।

কুমার সচমকে প্রশ্ন করলে, কী বলছেন আপনি?

মোহনলাল বিরক্ত ভাবে বললে, কুমারবাবু, অমাবস্যার রাতের রহস্য বোঝবার জন্যে আপনার এখানে আসা উচিত হয়নি। আপনি নিজের চোখকে যখন ব্যবহার করতে শেখেননি, তখন এ-রহস্যের কিনারা করবার শক্তিও আপনার নেই। আপনি জানেন যে, বাঘের কবলে পড়ে এখানে অনেক স্ত্রীলোকের প্রাণ গিয়েছে। আমাদের সামনে যে মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে, ওটা যে কোনও স্ত্রীলোকের মাথা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।...তার ওপরে, আপনি কি এও দেখতে পাচ্ছেন না যে, এ জায়গাটার নরম মাটির ওপরে চারিদিকেই রয়েছে বাঘের থাবার দাগ? দুইয়ে-দুইয়ে যোগ করলে কি হয় জানেন তো? চার! ওই মড়ার মাথাটা হচ্ছে, দুই। আর বাঘের থাবার দাগ হচ্ছে, দুই। এই দুই আর দুইয়ে যোগ করুন, চার ছাড়া আর কিছুই হবে না। অমাবস্যার রাতে এখানে বাঘের উপদ্রব না হলে আমরা আজ ওই মড়ার মাথা-টাকে কখনওই এ জায়গায় দেখতে পেতুম না।

অপ্রতিভ কুমার মাথা হেঁট করে মোহনলালের এই বক্তৃতা নীরবে সহ্য করলে। মোহনলালের সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে আজ সে হার না মেনে পারল না।

মোহনলাল লণ্ঠনটা সামনের দিকে এগিয়ে আবার বললে, কুমারবাবু, ওদিকটাও দেখেছেন কি?

খানিক তফাতে দেখা গেল, একরাশ হাড়ের স্তূপ। মানুষের হাতের হাড়, পায়ের হাড়, বুকের হাড়, মাথার খুলি, কত মানুষের হাড় যে ওখান জড় করা আছে, তা কে জানে। দেখলেই বুক ধড়াস করে ওঠে। এ যে মড়ার হাড়ের দেশ। যাদের ওই হাড়, তাদের অশান্ত প্রেতাত্মারাও কি আজ এই অন্ধকার কোটরের আনাচে-কানাচে আনাগোনা করছে, নিজেদের দেহের শুকনো হাড়গুলোকে আবার ফিরে পাবার জন্যে?

কেন সে জানে না, কুমারের বার বার মনে হতে লাগল, ইলেকট্রিক লণ্ঠনের আলোক রেখার ওপরে গাঢ় কালো অন্ধকার যেখানে এই চিররাত্রির আলোকহীন গর্তের মধ্যে থমথম করছে, সেখানে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে মানুষের চোখে অদৃশ্য হয়ে কারা সব প্রেতলোকের নিঃশব্দ ভাষায় ফিশফিশ করে কথা কইছে আর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছে।

এতক্ষণ ওই বীভৎস অস্থি-স্তূপের চারপাশে সার বেঁধে বসে যেন তারা নিজেদের মৃতদেহের হাড়গুলো খুঁজে বার করবার জন্যে হাতড়ে দেখছিল, এখন মানুষের হাতের আলোর ছোঁয়া লাগবার ভয়ে তারা সবাই অন্ধকারের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

কুমার আর থাকতে না পেরে, দুই হাতে মোহনলালের দুই কাঁধ প্রাণপণে চেপে ধরে বললে, মোহনবাবু! আর নয়, এখানে আর আমি থাকতে পারছি না,আকাশের আলোর জন্যে প্রাণ আমার ছটফট করছে, চলুন–বাইরে যাই চলুন।

মোহনলাল বললে, কুমারবাবু, আমারও মনটা কেমন ছাঁৎ ছাঁৎ করছে। মনে হচ্ছে যেন ভগবানের চোখ কখনও এই অভিশপ্ত অন্ধকারের ভিতরে সদয় দৃষ্টিপাত করেনি, জ্যান্ত

মানুষ যেন কখন এখানে আসতে সাহস করেনি।...আমিও আপনার মতো বাইরে যেতে পারলেই বাঁচি, কিন্তু তার আগে, একবার ওদিকটায় কি আছে, দেখে যেতে চাই।...আসুন।

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল আবার সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর, হাত ত্রিশ জমি পার হয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুমার আশ্চর্য নেত্রে দেখলে, সেখানেও ওপরে ছাদ রয়েছে, কিন্তু সামনের দিকে নীচে আর মাটি নেই, থইথই করছে জল আর জল।

বাঁ-দিকে দেওয়াল এবং সামনের দিকের প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট পরে আর একটা খাড়া দেওয়াল। তারই ভিতর একটা জলে পরিপূর্ণ দীর্ঘ খাল ডানদিকে সামনে চলে গিয়ে অন্ধকারের ভিতরে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোনও পাত্তা পাবার যো নেই।

কুমার অবাক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ পিছন দিকে কেমন একটা অস্ফুট শব্দ হল।

মোহনলাল বিদ্যুতের মতো ফিরে হাতের লণ্ঠনটা সুমুখে এগিয়ে ধরলে। এবং তার পরেই লণ্ঠনের আলোটা নিবিয়ে দিল।

সে কী দৃশ্য। অনেক দূরে শুড়িপথের যে দরজা দিয়ে তারা এখানে এসেছে, সেই দরজার ভিতর দিয়ে দলে দলে কারা সব হলঘরের ভিতরে এসে ঢুকছে। তাদের অনেকের হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন, কারুর হাতে বন্দুক এবং কারুর কারুর হাতে চকচক করছে বর্শা বা তরোয়াল। তাদের চেহারা কালো কালো, গা আদুড় এবং চোখ দিয়ে ঝরছে যেন হিংসার অগ্নিশিখা।

কিন্তু মোহনলাল ইলেকট্রিক লণ্ঠন নিবিয়ে ফেলবার আগেই আগন্তুকরা তাদের দেখে ফেললে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও হাতের সমস্ত আলো নিবে গেল। তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ হলগুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

কুমার ও মোহনলালের আশপাশ দিয়ে তিন চারটে বন্দুকের গুলি সোঁ সোঁ করে চলে গেল?

মোহনলাল বলে উঠল, কুমারবাবু, লাফিয়ে পড়ুন–লাফিয়ে পড়ুন।

কোথায়?

এই খালের জলে। বাঁচতে চান তো লাফিয়ে পড়ুন।

বলেই মোহনলাল লাফ মারলে, সঙ্গে সঙ্গে কুমারও দিল মস্ত এক লাফ।

ঝপাং, ঝপাং করে দুজনেই জলের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

মোহনলাল ইলেকট্রিক লণ্ঠনটা আর একবার জ্বালিয়ে বললে, এ জলে দেখছি স্রোতের টান। নিশ্চয়ই কোনও নদীর সঙ্গে এর যোগ আছে। সাঁতার দিয়ে স্রোতের টানের সঙ্গে ভেসে চলুন।

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হাত কয়েক তফাতে জল তোলপাড় করে প্রকাণ্ড কি একটা ভেসে উঠল।

কুমার সভয়ে বললে, কুমির, কুমির।

.

দশ । রহস্য বাড়ছে

অন্ধকার।

সামনে দপদপ করে দু-টুকরো আগুন জ্বলছে। সে দুটো কুমিরের চোখ, না সাক্ষাৎ মৃত্যুর চোখ?

ওপাশ থেকে মোহনলালের স্থির, গম্ভীর অথচ দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কুমারবাবু! টপ করে ডুব দিন। ডুব সাঁতার দিয়ে যতটা পারেন ভেসে যান। আবার ভেসে উঠে নিশ্বাস নিয়ে ডুব দিয়ে অন্যদিকে এগিয়ে যান। এইভাবে একবার ভেসে উঠে নিশ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলুন।

মোহনলালের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সামনের আগুন-চোখদুটো নিবে গেল। কুমার বুঝলে, কুমির শিকার ধরবার জন্যে ডুব দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সেও দিলে ডুব। নিশ্বাস বন্ধ করে জলের তলা দিয়ে ডান দিকে যতটা পারলে সাঁতরে এগিয়ে গেল। তারপর ভেসে উঠে নিশ্বাস নিয়েই আবার ডুব দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গেল। এমনি করে বারংবার ভেসে এবং বারংবার ডুবে এঁকেবেঁকে কুমার অনেকক্ষণ সাঁতার দিলে! সঙ্গে-সঙ্গে সে ভাবতে লাগল, মোহনলাল বিপদেও কী অটল। কী তার স্থির বুদ্ধি। সামনে ভীষণ কুমির দেখে সে যখন ভয়ে ভেবড়ে পড়েছে, মোহনলালের মাথা তখন বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করছে। মোহনলাল যে কৌশল তাকে শিখিয়ে দিলে সেটা সেও জানত কিন্তু কুমিরের মুখে পড়ে তার কথা সে স্রেফ ভুলে গিয়েছিল।

কুমিররা লক্ষ্য স্থির করে জলের ওপরে ভেসে উঠেই তারপর ডুব দিয়ে ঠিক লক্ষ্য স্থলে গিয়ে শিকার ধরে। কিন্তু ইতিমধ্যে যাকে সে ধরবে, সে যদি স্থান পরিবর্তন করে, তাহলে কুমির তাকে আর ধরতে পারে না।

খানিকক্ষণ পরেই কুমার দেখলে যে সামনের দিকে দুরে দিনের ধবধবে আলো দেখা যাচ্ছে। তাহলে ওইটুকু হচ্ছে সুড়ঙ্গ খালের মুখ?

কিন্তু পিছনে কালো জল তোলপাড় করে যে নির্দয় মৃত্যু তখনও এগিয়ে আসছে, তার কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তাকে তখনি আবার ডুব দিতে হল, আলো দেখে খুশি হবার বা মোহনলালের খোঁজ নেবার অবসর কুমারের এখন নেই!...

সুড়ঙ্গ খাল শেষ হল, কুমার বাইরের উজ্জ্বল সূর্য কিরণে এসে দেখলে, অদূরেই মোহনলালও নদীর ওপরে ভেসে উঠল।..কুমার বুঝলে, খাল কেটে গাঁয়ের কাজলা নদীর

জলই সেই প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এসব হচ্ছে সেকেলে ডাকাতদের কাণ্ড।

পিছনে তাকিয়েই দেখলে সে একগুয়ে কুমিরটাও জলের ওপরে জেগে উঠল, মোহনলালের খুব কাছেই।

মোহনলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত স্বরে চেঁচিয়ে বললে, ভারি তো জ্বালালে দেখছি। এ আপদ যে কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না। কুমির ও মোহনলাল আবার জলের তলায় অদৃশ্য হল।

এবারে কুমার আর ডুব দিল না, কারণ সে বুঝে নিলে, কুমিরের লক্ষ্য এখন মোহনলালের দিকেই।

আবার মোহনলাল খানিকটা তফাতে গিয়ে ভেসে উঠল এবং কুমিরটাও ভেসে উঠল ঠিক সেইখানেই, একটু আগেই মোহনলাল যেখান থেকে ডুব মেরেছিল। আবার শিকার ফসকেছে দেখে কুমিরটা নিষ্ফল আক্রোশে জলের ওপরে ল্যাজ আছড়াতে লাগল মানুষ খেতে এসে তাকে এমন বিষম পরিশ্রম বোধহয় আর কখনও করতে হয়নি।

মোহনলাল বললে, না, এ লুকোচুরি খেলা আর ভালো লাগছে না,–দেখি, এতেও ব্যাটা ভয় পায় কিনা!–বলেই সে কুমিরের চোখ টিপ করে উপর-উপরি তিনবার রিভলভার ছুঁড়ে সাঁৎ করে জলের তলায় নেমে গেলসঙ্গে-সঙ্গে কুমিরও অদৃশ্য!

রিভলভারের গুলিতে কুমির যে মরবে না, কুমার তা জানত। যত বড় জানোয়ারই হোক সাধ করে কেউ রিভলভারের গুলি হজম করতে চায় না। তাই এবার মোহনলাল ভেসে ওঠবার পরেও কুমিরটার ল্যাজের একটুখানি ডগা পর্যন্ত দেখা গেল না।

মোহনলাল বললে, মানুষ খাবার চেষ্টা করলে যে সবসময়ে আরাম পাওয়া যায় না, কুমিরটা বোধহয় তা বুঝতে পেরেছে! অন্তত তার একটা চোখ যে কানা হয়ে যায়নি, তাই বা কে বলতে পারে?...চলুন, কুমারবাবু, আমরা ডাঙায় গিয়ে উঠি।

তীরে উঠে মোহনলাল বললে, এসেছিলুম পটলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু আপনি কি বলেন কুমারবাবু, এ-অবস্থায় আমাদের কি আর কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া উচিত?

কুমার বললে, পটলবাবুর সঙ্গে আর একদিন দেখা করলেই চলবে। আর সত্যিকথা বলতে কি, পটলবাবুর ওপরে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে।

কেন?

পটলবাবুর বাড়ির ভেতর আজ যা দেখলুম, তার সঙ্গে তাঁর যে যোগ নেই, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

না, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু পটলবাবু তো অনায়াসেই বলতে পারেন যে, এই সেকেলে প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভাঙা ইটের রাশির ভেতরে কোনও মানুষ ভরসা করে পা বাড়ায় না। তিনি এর বারমহলটাই মেরামত করে নিয়েছেন, এর ভেতরে তিনিও কোনওদিন ঢোকেননি, সুতরাং এর মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা তিনি কেমন করে জানবেন?

তিনি বললেই আমরা কি মেনে নেব?

অগত্যা। না মেনে উপায় কি? আমাদের প্রমাণ কোথায়? বাড়ির ভাঙা মহলগুলো তো দিন রাতই খোলা পড়ে থাকে, বাইরের যে-কোনও লোক যখন খুশি তার ভেতরে ঢুকতে পারে–যেমন আজ আমরা ঢুকেছিলুম, অথচ পটলবাবু কিছুই টের পাননি। ডাকাত বা অন্য কোনও বদমাইশের দল কোনও অজানা গুপ্তপথ দিয়ে তার মধ্যে ঢুকে কখন কোথায় আস্তানা পাতে, সেকথা তিনি কী করে জানবেন? ভাঙা বাড়ির ভেতরে যে বাঘের আড্ডা আছে, এটাও তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর বুনো বাঘ যদি মানুষ ধরে খায়, সেজন্যেও কেউ পটলবাবুর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারে না। আর এ হচ্ছে আশ্চর্য বুনো বাঘ–পোড়া-বাড়িতে থাকে, তিথি-নক্ষত্রের খবর রাখে, অমাবস্যার রাত না হলে তার খিদে হয় না,

গয়না-পরা স্ত্রীলোক ছাড়া আর কারুকে সে ধরে না, আবার সঙ্গে করে আনে ডাকাতের দল?

কুমার সন্দেহপূর্ণ কণ্ঠে বললে, প্রতি অমাবস্যার রাতে এখানে এসে যে দেখা দেয়, সে কি সত্যি-সত্যিই বাঘ, না আর কিছু?

আপনি তো স্বচক্ষেই বাঘটাকে দেখেছেন। আমিও দেখেছি এ যে আসল বাঘই বটে, তারও প্রমাণ আজ পেয়েছি। পোড়াবাড়ির অন্ধকার গহ্বরে মানুষের হাড়ের স্তূপ তো দেখেছেন। যাদের রক্ত-মাংস গেছে বাঘের জঠরে, সেই অভাগাদেরই হাড়ের রাশি সেখানে পড়ে রয়েছে।

কুমার ভাবতে-ভাবতে বললে, এ বাঘ কি মায়া-বাঘ, না এ-সব ভূতুড়ে কাণ্ড?

গাঁয়ের লোকেরাও বলে, এইসব ভূতুড়ে কাণ্ড। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি আইনের কাছে ভূতুড়ে কাণ্ড বলে কোনও কাণ্ডই নেই। আমরা একালের সভ্য লোক, ভূত তো কোন ছাড়, ভগবানকেই আমরা উড়িয়ে দিতে পারলে বেঁচে যাই। কিন্তু যাক সে কথা। এখন আপনি কি করবেন?

থানায় ফিরে যাব।

কিন্তু সাবধান, আজ যা দেখেছেন, থানার কারুর কাছে তা প্রকাশ করবেন না।

অমাবস্যার রাতের রহস্য যদি জানতে চান, তাহলে একেবারে মুখ বন্ধ রাখবেন। পুলিশের কাছে এখন কিছু জানালেই তারা বোকার মতো গোলমাল করে সব গুলিয়ে দেবে। আজ যা দেখলুম তাতে মনে হয়, আপনি চুপচাপ থাকলে আসছে অমাবস্যাঁতেই সব রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে। আজ আর এর বেশি কিছু বলব না। নমস্কার। মোহনলাল তার বাসার দিকে চলে গেল।

কুমার চিন্তিত মুখে থানার দিকে এগিয়ে চলল। বাসার কাছ বরাবর এসেই সে দেখলে চন্দ্রবাবু একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে থানার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

কুমারকে দেখেই তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে বললেন, এই যে কুমার! তোমার জন্যে আমার বড় ভাবনা হয়েছিল।

কেন চন্দ্রবাবু?

আমি শুনলুম তুমি আর মোহনলাল নাকি নদীতে কুমিরের মুখে পড়েছ! এখন তোমাকে দেখে আমার সকল ভাবনা দূর হল। যাক এ-যাত্রা তাহলে তুমি বেঁচে গিয়েছ।

এ যাত্রা কেন চন্দ্রবাবু, অনেক যাত্রাই এমনি আমি বেঁচে গেছি। তবে একদিনের যাত্রায় মরণকে যে আর ফাঁকি দিতে পারব না, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই।

কুমিরটা কি মোহনলালের রিভলভারের গুলি খেয়েই পালিয়ে গেছে?

গাঁয়ের চারিদিকেই আমার গুপ্তচর আছে, একথা তো তুমি জানো!..কিন্তু মোহনলাল কোথায়?

তুমি থানায় গিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো বদলে ফেলো, ততক্ষণ আমি মোহনলালের বাড়িটা একবার ঘুরে আসি।

কেন সেখানে আবার কি দরকার।

চন্দ্রবাবু এগুতে-এগুতে বললেন, আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।

.

এগারো । এই কি ভুলু-ডাকাত?

চন্দ্রবাবু যাচ্ছেন মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে! কেন?

থানার ভিতরে গিয়ে এখন ভিজে কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে কুমারের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেওয়া উচিত। কিন্তু চন্দ্রবাবুর কথা শুনে কুমার বিশ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেল, তাড়াতাড়ি চন্দ্রবাবুর পিছনে ছুটে গিয়ে কুমার জিজ্ঞাসা করলে, মোহনলাল বাবু কি করেছেন? আপনি তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন কেন?

চন্দ্রবাবু বললেন, তুমি তো জানো কুমার, মোহনলালের ওপরে গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ আছে। কে সে, কোথাকার লোক, এত বেড়াবার জায়গা থাকতে মানসপুরেই বা তার বেড়াতে আসবার শখ হল কেন, এসব কিছুই আন্দাজ করবার উপায় নেই। তার সবই যেন রহস্যময়। আমার গুপ্তচর দেখেছে, সে প্রায়ই নিশুতি রাতে বাসা থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। ভেবে দেখো, মানসপুরে সন্ধে হলে যখন সবাই দরজায় খিল এঁটে ভয়ে কাঁপতে থাকে, মোহনলাল তখন সুন্দরবনের ঝোপে ঝাপে ঘুরে বেড়ায়। তাই তো পটলবাবু সন্দেহ করেন যে, মোহনলাল হচ্ছে ভুলু-ডাকাতেরই দলের লোক।

কুমার বললে, কিন্তু এসব তো খালি সন্দেহের কথা! মোহনলালবাবুকে গ্রেপ্তার করতে পারেন, এমন কোনও প্রমাণ তো আপনি পাননি!

এতদিন তা পাইনি বলেই, মোহনলাল যে সাংঘাতিক লোক, এবারে সে প্রমাণ আমি পেয়েছি।

প্রমাণ! কি প্রমাণ?

চন্দ্রবাবু বললেন, আমার গুপ্তচর এসে কিছুদিন আগে খবর দিয়ে গিয়েছিল যে, মোহনলালকে সে একটা রিভলভার সাফ করতে দেখেছে। জানো তো, রিভলভার ব্যবহার করলে লাইসেন্স নিতে হয়? আমি কলকাতায় তার করে জেনেছি যে, মোহনলালের নামে কোনও রিভলভারের লাইসেন্স নেই। এ একটা কতবড় অপরাধ, তা কি বুঝতে পারছ কুমার? লাইসেন্স নেই, মোহনলাল তবু রিভলভার ব্যবহার করছে। বিপ্লববাদী কি ডাকাত

ছাড়া এমন কাজ আর কেউ করে না। আপাতত এই অপরাধেই আমি মোহনলালকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি।

কুমার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, তবে কি মোহনলাল সত্যি-সত্যিই দোষী? সে কি ডাকাত? মানুষ খুন করাই কি তার ব্যবসা! কিন্তু তা হলে অমাবস্যার রাতের রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে তার এত বেশি আগ্রহ কেন? আর মোহনলাল যদি ডাকাতদেরই কেউ হয়, তবে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ডাকাতদের দেখে ভয়ে পালিয়ে এল কেন! এসব কি ছলনা! তার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে চন্দ্রবাবু ও পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে কুমার এগিয়ে চলল এবং ক্রমে অশথ-বট ও তাল-নারিকেলের ছায়া-খেলানো আঁকাবাঁকা মেটেপথ দিয়ে কুমার মোহনলালের বাসার সুমুখে গিয়ে পড়ল।

খানিকটা খোলা জমি। মাঝখানে একখানা ছোট তেতলা বাড়ি। ডানপাশে মস্ত একটা বাঁশঝাড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে এবং বামপাশ দিয়ে বর্ষায়, কাজলা নদীর ঘোলা জল নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে।

চন্দ্রবাবু ও কুমার বাড়ির সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। চন্দ্রবাবু দুজন পাহারাওয়ালাকে ডেকে বললেন, বাড়ির পেছনে একটা খিড়কির দরজা আছে। তোমরা সেই দরজার গিয়ে পাহারা দাও।

পাহারাওয়ালারা তার হুকুম তামিল করতে ছুটল। চন্দ্রবাবু দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন, কিন্তু কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না।

চন্দ্রবাবু কড়া নাড়তে নাড়তে এবারে চিৎকার শুরু করলেন, মোহনলালবাবু, ও মোহনলালবাবু!

সাড়াশব্দ কিছুই নেই। আরও কিছুক্ষণ কড়া নেড়ে ও চিৎকার করে চন্দ্রবাবু শেষটা খাপ্পা হয়ে বললেন, মোহনলালবাবু এ ভালো হচ্ছে না কিন্তু! এইবারে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলব!

এতক্ষণে দরজাটা খুলে গেল। মস্ত বড় একমুখ পাকা দাড়ি-গোঁফ নিয়ে একটা খোট্টা চাকর দরজার ওপরে এসে দাঁড়াল। ভাঙা ভাঙা বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে, কাকে খোঁজা হচ্ছে!

চন্দ্রবাবু বললেন, মোহনলালবাবু কোথায়?

সে জানালে, বাবু তেতলার ছাদের ওপরে আছেন।

তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে চারজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে চন্দ্রবাবু রেগে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন, কুমারও পিছনে-পিছনে গেল।

সামনেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে সকলে দ্রুতপদে একেবারে তেতলায় ছাদে গিয়ে উঠল। তেতলার ছাদের ওপরে একটা চিলে ছাদ। মোহনলাল পরম নিশ্চিন্ত মুখে সেই ছাদের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

চন্দ্রবাবু বললেন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙে গেল, তবু মশাইয়ের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না কেন?

মোহনলাল গম্ভীর ভাবে শান্ত স্বরে বললে, আমি যে গান গাইছিলুম! গান গাইতে গাইতে সাড়া দেব কেমন করে?

চন্দ্রবাবু চটেমটে বললেন, আবার ঠাট্টা হচ্ছে? এখন লক্ষ্মীছেলের মতো সুড় সুড় করে ওখান থেকে নেবে এসো দেখি, তারপর দেখা যাবে, কেমন গান গাইতে পারো!

মোহনলাল একগাল হেসে বললে, আমাকে এত আদর করে নীচে নামতে বলছেন কেন চন্দ্রবাবু?

চন্দ্রবাবু বললেন, তোমাকে দিল্লির লাড্ড খাওয়াব কিনা, তাই এত সাধাসাধি করছি?

মোহনলাল খুব ফুর্তির সঙ্গে দুই হাতে তুড়ি দিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে গান ধরে দিলে–

লাড্ডু যদি এনে থাকো, গিয়ে দাদা, দিল্লি
ঢেকেঢুকে রেখো, যেন খায়নাকো বিল্লি!
কিবা তার তুল্য?
শুনে মন ভুললো।
খেলে যে বোলোনাকো–কেন সব গিললি?

চন্দ্রবাবু রেগে টং হয়ে বললেন, আবার আমার সঙ্গে, মশকরা? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার মজাটা!

মোহনলাল তেমনি হাসিমুখে বললে, মজা দেখাবেন? দেখান না চন্দ্রবাবু! আমি মজা দেখতে ভারি ভালোবাসি!

হ্যাঁ, দু-হাতে যখন লোহার বালা পড়বে, মজাটা তখন ভালো করেই টের পাবে বাছাধন!

বিস্মিত স্বরে মোহনলাল বলল, লোহার বালা? সে কি দাদা? আপনাদের দেশে সোনার বালা কেউ পরে না?

চন্দ্রবাবু হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, ফের ঠাট্টা? তবে রে পাজি? তবে রে ডাকু! চৌকিদার! যাও, চিলের ছাদে উঠে ও-বদমাইশটাকে কান ধরে টেনে নামিয়ে এসো তো।

পাহারাওয়ালা অগ্রসর হল কিন্তু, মোহনলাল একটুও দমল না? হো হো করে হেসে উঠে ডানহাতখানা হঠাৎ মাথার ওপর তুলে সে বললে, আমার ডানহাতে কি রয়েছে, সেটা দেখতে পাচ্ছেন তো?

মোহনলালের ডানহাতে কালো রঙের গোলাকার কি একটা জিনিস রয়েছে বটে। চন্দ্রবাবু সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন কি ওটা?

বোমা।

শুনেই পাহারাওয়ালারা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এল। মোহনলাল বললে, আমার দিকে কেউ এক পা এগিয়ে এলেই আমি এই বোমা ছুড়ব–সঙ্গে সঙ্গে বাড়িখানা উড়ে যাবে!

চন্দ্রবাবু শুকনো গলায় বললেন, কিন্তু তাহলে তুমিও বাঁচবে না।

না, আমিও বাঁচব না, আপনারাও বাঁচবেন না?

চন্দ্রবাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, মোহনলাল, আমাকে ভয় দেখিয়ে তুমি পালাতে পারবে না। কর্তব্যের জন্যে যদি আমাকে মরতে হয়, তাহলে আমি মরতেও রাজি আছি।

আচম্বিতে ভীষণ চিৎকার করে মোহনলাল বললে, তবে মর। –বলেই হাতের সেই বোমাটা সে সজোরে চন্দ্রবাবুর দিকে নিক্ষেপ করলে।

পর-মুহূর্তে কুমারের মনে হল চোখের সামনে সারা পৃথিবীর আলো দপ করে নিভে গেল এবং ভয়ঙ্কর একটা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে রাশিকৃত ভাঙা ইট-কাঠ-ধুলো-বালি ও রাবিশের ফোয়ারার মধ্যে তার দেহটা হাড়গোড় ভাঙা দয়ের মতন আকাশের দিকে ঠিকরে উঠে গেল।

এবং তারপরে বিস্ময় আর আতঙ্কে প্রথম ধাক্কাটা সামলে দেখলে,না, তারা আকাশে উড়ে যায়নি, পৃথিবীতেই বিরাজ করছে এবং চোখের সমুখেই ছাদের ওপরে একটা কালো রবারের বল লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। দুই হাতে মুখ চেপে চন্দ্রবাবু ছাদের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসেছেন এবং চারজন পাহারাওয়ালা চারদিকে চিৎপাত বা উপুড় হয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

বারবার বিপদে পড়ে কুমারের আত্মসংবরণ করবার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল, তাই সকলের আগে সেইই বুঝতে পারলে যে মোহনলাল যেটা ছুঁড়েছিল, সেটা বোমা-টোমা কিছুই নয়, একটা তুচ্ছ রবারের বল মাত্র।

সকৌতুকে হেসে উঠে কুমার বললে, চন্দ্রবাবু, ও চন্দ্রবাবু। চোখ খুলে দেখুন, আমরা কেউ এখনও সশরীরে স্বর্গে যাই নাই।

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে একটা নিশ্বাস ফেলে চন্দ্রবাবু বললেন, আঁ? আমরা বেঁচে আছি? আমরা মরিনি? বলো কি হে। বোমাটা তাহলে ফাটেনি? দুর্গা, দুর্গা মস্ত একটা ফঁড়া কেটে গেল।

কুমার বললে, না, বোমা ফাটেনি–ওই যে, আপনার পায়ের তলাতেই বোমাটা পড়ে রয়েছে।

ঠিক স্প্রিংওয়ালা পুতুলের মতো মস্ত একটা লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রবাবু বললে, বলো কিহে? চৌকিদার! এই চৌকিদার! বোমাটা শীগগির এখান থেকে সরিয়ে ফ্যাল শিগগির! নইলে এখনও হয়তো ওটা ফাটতে পারে।

কুমার বললে, ঠান্ডা হোন চন্দ্রবাবু ঠান্ডা হোন। বোমা ছোড়েনি–ওটা একটা রবারের বল ছাড়া আর কিছুই নয়।

চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে বলটার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ গর্জন করে বললেন, কী। আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা? তবে রে রাসকেল–বলে চিলের ছাদের দিকে

কটমট করে তাকিয়েই তার মুখ যেন সাদা হয়ে গেল। বিদ্যুতের মত চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি আবার বললেন, মোহনলাল? মোহনলাল কোথায় গেল?

কুমার সচমকে চিলের ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সত্যিই তো, সেখান থেকে মোহনলালের মূর্তি যেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়েছে।

চন্দ্রবাবু উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, কোথায় গেল মোহনলাল? কোন দিক দিয়ে সে পালাল?

কুমার বললে, এখান থেকে পালাবার কোনও পথই নেই!

তবে কি সে মরিয়া হয়ে চারতলার ছাদ থেকেই নীচে লাফ মারলে? বলেই চন্দ্রবাবু ছুটে ছাদের ধারে গিয়ে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করলেন, কিন্তু সেখানেও মোহনলালের চিহ্নমাত্র নেই।

কপালে করাঘাত করে চন্দ্রবাবু বললেন, অ্যাঁ! একটা বাজে আর বিশ্রী ঠাট্টা করে লোকটা কিনা আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল? উঃ! কী ভয়ানক লোকরে বাবা। এর পরেও আমার চাকরি আর কী করে বজায় থাকে বলো।

কিন্তু কুমার এত সহজে বোঝ মানবার ছেলে নয়। সে কিছু না বলে বরাবর নেমে একতলায় গেল। তারপর বাড়ির বাইরে ঠিক চিলের ছাদের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে যা দেখলে তা হচ্ছে এই

ঠিক চিলের ছাদের নীচেই, মাটির ওপরে প্রায় দু-গাড়ি বালি পাকার হয়ে আছে। এবং সেই বালির স্তূপের মধ্যে একটা বড় গর্ত–অনেক উঁচু থেকে যেন একটা ভারি জিনিস সেখানে এসে পড়েছে। মোহনলাল তাহলে ছাদের ওপর থেকে এই নরম বালির গাদায় লাফিয়ে পড়ে অনায়াসেই চম্পট দিয়েছে?

কুমার তখনই চন্দ্রবাবুকে ডেকে এনে ব্যাপারটা দেখাল। দেখে-শুনে চন্দ্রবাবু তো একেবারেই অবাক! খানিক পরে দুই চোখ ছানাবড়ার মতন বড় করে তিনি বলে উঠলেন, শাবাশ বুদ্ধি! মোহনলাল যে দেখছি পালাবার পথ আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিল। কুমার আমি হলপ করে বলতে পারি, এই মোহনলাল বড় সহজ লোক নয়, এ এখানে বেড়াতেও আসেনি,–এ ভুলু-ডাকাতের চরও নয়,–এ হচ্ছে নিজেই ভুলু-ডাকাত!

থানায় ফিরে আবার নতুন এক বিস্ময়! কুমার নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলে, মেঝের ওপর একখানা খাম পড়ে আছে–যেন জানলা গলিয়ে কেউ সেখানা ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

চিঠিখানা এই–

কুমার বাবু,

আসছে অমাবস্যার রাতে আপনি পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির শুড়িপথের কাছাকাছি ঝোপঝাপে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন। সঙ্গে বন্দুক, রিভলবার আর টর্চলাইট নিয়ে যেতে ভুলবেন না।

আসছে অমাবস্যার রাতেই রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে!

ইতি–বন্ধু
পুনঃ–এই চিঠির কথা ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রবাবুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

কুমার চিঠি পড়ে নিজের মনেই বললে, কে এই চিঠি লিখেছে? বন্ধু? এখানে কে আবার বন্ধু? মোহনলাল? সে তো পলাতক। তবে কি বনের ভিতরে গর্তের ভিতর থেকে আমাকে যে উদ্ধার করেছিল এ কি সেই ব্যক্তি? কে সে?

কুমারের ভাবনায় বাধা পড়ল। আচম্বিতে ঝড়ের মতো চন্দ্রবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন–তাঁরও হাতে একখানা চিঠি।

চন্দ্রবাবু বললেন, দেখো কুমার এ আবার কী ব্যাপার! আমার শোবার ঘরের ভিতরে বাইরে থেকে এই চিঠিখানা কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে!

চিঠিখানা নিয়ে কুমার বুঝলে, একই লোক তাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছে। এ পত্রখানায় লেখা ছিল–

চন্দ্রবাবু আসছে অমাবস্যার রাতে পটলবাবুর ভাঙা বাড়ির পিছনে কাজলা নদীর জল যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে, ঠিক সেইখানেই অনেক লোকজন আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকবেন।

সেই রাত্রেই আপনি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। ইতি–বন্ধু

.

বারো। আবার সেই রাত!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অমাবস্যার সেই ভয়ানক রাত আবার এসেছে, কিন্তু বারোটা বাজতে এখনও অনেক দেরি।

কুমার নিজের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলে, চন্দ্রবাবু ধড়াচুড়ো পরে প্রস্তুত হচ্ছেন। সেই অজানা বন্ধুর কথামতো চন্দ্রবাবু যে আজ পটলবাবুর ভাঙাবাড়ির পিছনে কাজলা-নদীর সুড়ঙ্গখালের মুখে গিয়ে সদলবলে পাহারা দিতে ভুলবেন না, কুমার তা বেশ জানত। এবং এটাও সে জানত যে, যাবার আগে তারও ডাক পড়বে–চন্দ্রবাবু তাকেও তার সঙ্গে যেতে বললেন।

কিন্তু সেই অজানা বন্ধু তাকে ভাঙা-বাড়ির ভিতরে শুঁড়িপথের কাছাকাছি কোনও ঝোপেঝাপে লুকিয়ে থাকতে বলেছে। চন্দ্রবাবুর কাছে আবার একথা প্রকাশ করতে বারণও আছে তাই কুমার তাকে কোনও কথাই জানায়নি। কাজে কাজেই পাছে চন্দ্রবাবু

তাকে সঙ্গে যাবার জন্যে ডাকেন, সেই ভয়ে কুমার চুপিচুপি থানা থেকে আগে থাকতেই বেরিয়ে পড়ে পটলবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু এই অজানা বন্ধুই বা কে, আর চন্দ্রবাবুর কাছে এত লুকোচুরির কারণই বা কি, অনেক মাথা ঘামিয়েও কুমার সেটা আন্দাজ করতে পারেনি। আজও সেই কথাই ভাবতে ভাবতে কুমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ চলতে লাগল?

অন্ধকারকে আরও ঘন করে তুলে ওই তো পটলবাবুর প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তবে দেওয়ালকে শক্ত শিকড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে যে সব বড় বড় অশ্বথ বট মাথা খাড়া করে আছে, প্রবল বাতাসে নিজেরা দুলতে-দুলতে তারা যেন অন্ধকারকেও দুলিয়ে দিয়ে বলছে– সর- সর- সর, মরমর-মর মর! কুমারের মনে হল, অন্ধকার-রাজ্যের ভিতর থেকে যেন সজাগ ভূতুড়ে পাহারাওয়ালারা কথা কইছে!

আন্দাজে-আন্দাজে সে সেই মস্তবড় ভাঙা সিং-দরজার তলায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অন্ধকারে আর তো এগোনো চলে না। কুমার কান পেতে খুব তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে! কিন্তু দেখাও যায় না এবং গাছপালায় মর্মর শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনাও যায় । সে তখন টর্চলাইটটা টিপে মাঝে-মাঝে আলো জ্বেলে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

আবার সেইসব বিভীষিকা! মাথার ওপরে উড়ন্ত প্রেতাত্মার মতো ঝটপট ঝটপট করে বাদুড়ের দল যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে,দু-দুটো গোখরো সাপ ফণা তুলে ফোঁস করে উঠেই টর্চলাইটের তীব্র আলোয় ভয় পেয়ে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে পালিয়ে গেল, চকমিলানো ঘরগুলোর ও দালানের আনাচ-কানাচ থেকে যেন কাদের হিংসুক, ক্ষুধিত ও জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যায়। দিনের বেলাতেই যে নির্জন, বিপদপূর্ণ বাড়ির ভীষণতা মনকে একবারে কাবু করে দেয় অমাবস্যার কালো রাতে সে-বাড়ি যে আরও কত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে, কুমারের আজ সেটা আর বুঝতে বাকি রইল না! তবু সেদিন মোহনলাল সঙ্গে ছিল, আর আজ সে একা! কুমারের প্রাণ খুব কঠিন, তাই

এখনও সে অটল পদে এগিয়ে যাচ্ছে? অন্য কেউ হলে এতক্ষণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

কুমার ভয় পেলে না বটে, কিন্তু তারও বার বার মনে হতে লাগল, এই প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়িটা হানাবাড়ি না হয়ে যায় না।–এ হচ্ছে নিষ্ঠুর ডাকাত-জমিদারের বাড়ি, কত মানুষ এখানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অপঘাতে মারা পড়েছে, কে তা বলতে পারে? নিশ্চয়ই তাদের আত্মার গতি হয়নি–নিশ্চয়ই তারা নিঃশব্দে কেঁদে-কেঁদে বাতাসে-বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে-মাঝে উঁকি মেরে তাকে দেখছে।

আচম্বিত কুমার সচমকে শুনলে, ঠিক তার পিছনে কার পায়ের শব্দ! সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান পেতে শুনলে! শব্দটব্দ কিছুই নেই! তারই শোনবার ভুল,–এই ভেবে কুমার আবার এগুলো। আবার সেই পায়ের শব্দ! আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের শব্দও থেমে গেল!

না, তার শোনবার ভুল নয়। কেউ তার পিছু নিয়েছে। কিন্তু কে সে? ভূত, না মানুষ, না হিংস্র জন্তু?

সন্তর্পণে কুমার অগ্রসর হল, অমনি সেই পায়ের শব্দও জেগে উঠল।

হঠাৎ কুমার তিরবেগে ফিরে দাঁড়াল–তার একহাতে জ্বলন্ত টর্চলাইট আর একহাতে রিভলভার!

কারুকে দেখা গেল না বটে, কিন্তু উঠানের ওপরে একটা মস্ত ঝোপ দুলছে। কেউ কি ওখানে লুকিয়ে আছে? যদি সে তাকে দেখে থাকে, তাহলে তারও আর আত্মগোপন করা বৃথা!

অত্যন্ত সাবধানে, রিভলভারের ঘোড়ার ওপরে আঙুল রেখে, টর্চের পূর্ণ আলো ঝোপের ওপরে ফেলে কুমার পায়ে পায়ে সেই দিকে ফিরে গেল।

ঝোপের সুমুখে গিয়ে কুমার শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, যদি কেউ এখানে থাকো, তাহলে বেরিয়ে এসো,নইলে এই আমি গুলি করলুম।

কোনও সাড়া নেই!–ভালো করে সে তখন ঝোপটা নেড়ে-চেড়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই আবিষ্কার করতে পারলে না কেবল খানিক তফাতের আর একটা ঝোপ থেকে একটা শেয়াল বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

হয়তো ওই শেয়ালের পায়ের শব্দেই সে ভয় পেয়েছে,–এই ভেবে কুমার আবার অগ্রসর হল। দুপা যায়, থামে, আর শোনে। কিন্তু পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। ওই তো সেই শুঁড়িপথ! সে আর মোহনলাল সেদিন ওরই মধ্যে ঢুকে বিপদে পড়েছিল! আজ এইখানেই তার অপেক্ষা করবার কথা।

ঝোপঝাপ এখানে সর্বত্র। শুড়িপথের একপাশে এমন একটা ঝোপ বেছে নিয়ে কুমার গা-ঢাকা দিয়ে বসল–যাতে তার পিছনদিকে থাকে বাড়ির দেওয়াল। অন্তত পিছন দিক থেকে কোনও গুপ্তশত্রুর আক্রমণের ভয় আর রইল না।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কুমার অবাক হয়ে শুনলে, খুব কাছেই অন্তরালে বসে কে যেন সকৌতুকে প্রবল হাসির ধাক্কা সামলাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু সে যেইই হোক, কুমারের আর খোঁজাখুঁজি করবার আগ্রহ হল না। সে কেবল বাঁধন খুলে পিঠের বন্দুক হাতে নিলে। তখন তার পিছনে রইল দেওয়াল আর হাতে রইল বন্দুক আর সামনের দিকে জেগে রইল তার সাবধানী দুই চক্ষু, তখন কোনও শত্রুরই তোয়াক্কা সে রাখে না! জন্তু, মানুষ ও অমানুষ, অমন অনেক শত্রুকেই এ জীবনে সে দেখেছে, শত্রুর ভয়ে তার বুক কোনওদিন কাঁপেনি, আজও কাঁপবে না।

কিন্তু, শত্রু তবু এল! একলা নয়, চুপিচুপি নয়–দলে দলে, ভীম বিক্রমে কোলাহল করতে-করতে! অমন উঁচু দেওয়াল তার পৃষ্ঠরক্ষা করতে পারলে না এবং তার গুলি-ভরা বন্দুক-রিভলভারও তাদের পিছনে হটাতে পারলে না–তাদের কাছে কুমারকে আজ

কাপুরুষের মতন পরাজয় স্বীকার করতে হল–হয়তো আজ তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে!

কুমার ভ্রমে সন্দেহ করেনি যে, ঝোপঝাপের ভিতরে এমন অসংখ্য শত্রু এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল। তারা হচ্ছে ডাঁশ-মশা!

উঃ, কী তাদের হুলের জোর, আর তাদের বিজয়-হুঙ্কার, আর কী তাদের অশ্রান্ত আক্রমণ। দেখতে-দেখতে কুমারের হাত-পা মুখ ফুলে উঠতে শুরু করল, নাকের ডগাটা দেখতে হল যেন দুগুণ বড় একটা টোপাকুলের মতো এবং গাল ও কপাল হয়ে গেল দাগড়া দাগড়া। মুখ। ও হাত-পা পেটের ভিতরে যথাসাধ্য গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে কুমার ঝোপের মধ্যে পড়ে রইল, যেন একটা কুমড়ো! ময়নামতীর মায়াকাননের মাংসের মস্ত পাহাড়ের মতো ডাইনসরও তাকে বোধ হয় এতটা কাবু করে ফেলতে পারত না। কুমার ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল–এ মশার পালের হাজার-হাজার হুলের খোঁচার চেয়ে অমাবস্যার রাতের সেই ভয়াবহ ব্যাঘ্রের থাবা তাবার কাছে এখন ঢের বেশি আরামের বলে মনে হল।

আচম্বিতে চারিদিক কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কুমার হাতের রেডিয়াম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাত বারোটা বাজতে মোটে দেড়-মিনিট দেরি আছে।

কি-একটা আসন্ন আতঙ্কের সম্ভাবনায় স্তম্ভিত অন্ধকার যেন আরও কালো হয়ে উঠল। অন্ধ রাত্রির বুক পর্যন্ত যেন ভয়ে টিপটিপ করতে লাগল–পাচা, বাদুড় ও চামচিকের মিলিত আর্তনাদে চারদিকের স্তব্ধতা যেন ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেল।–পোড়ো-বাড়ির অলি-গলিতে এতক্ষণ যারা নিশ্চিন্ত হয়ে লুকিয়েছিল, সেইসব অজানা নানা পশুর দল পর্যন্ত কি এক দুরন্ত বিভীষিকা দেখে প্রাণভয়ে বেগে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করলে! এখন এ স্থান যেন মানুষ তো দূরের কথা বন্য পশুর পক্ষেও নিরাপদ নয়।

কুমার হাজার-হাজার মশার কামড় পর্যন্ত ভুলে গেল–তার বাঁ-হাত ধরে আছে বন্দুকটা এবং ডান হাত স্থির হয়ে আছে বন্দুকের ঘোড়ার উপরে!

হঠাৎ ও কী ও? অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে একটা আঁধারে লণ্ঠন হাতে নিয়ে আচম্বিতে এক মনুষ্য মূর্তি আবির্ভূত হল এবং এত তাড়াতাড়ি সাঁৎ করে সে দৌড়ে সেই ভীষণ শুড়িপথের ভিতরে মিলিয়ে গেল যে, কুমার তার মুখ পর্যন্ত দেখবার সময় পেলে না! তাকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু সত্যিই কি সে মানুষ?

চারিদিকে জীবজন্তুর ছুটোছুটি, পাচা-বাদুড় চামচিকের চ্যাঁচামেচি অকস্মাৎ থেমে গেল এবং পরমুহূর্তে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতার মধ্যে পোড়াবাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল–

এবং তার পরেই সেই অপার্থিব স্তব্ধতা ছুটিয়ে দিল ব্যাঘ্রের ভৈরব গর্জন! একবার, দুবার, তিনবার সেই গর্জন জেগে উঠে পৃথিবীর মাটি থরথরিয়ে কাঁপয়ে আকাশ-বাতাসকে থমথমে করে দিলে–তারপর সব আবার চুপচাপ!

কয়েক মুহূর্ত কাটল। তারপর কুমারের চোখ দেখলে শুড়িপথের সামনে কি একটা ভয়ঙ্কর ছায়া তারা দৃষ্টি রোধ করে দাঁড়াল। পিছন থেকে কে চুপিচুপি বললে, ওই বাঘ! গুলি কর–গুলি কর!

কে যে একথা বললে, কুমারের তা আর দেখবার অবকাশ রইল না, তাড়াতাড়ি সে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার পিছন থেকেও কে বন্দুক ছুড়লে!

গুড়ুম! গুড়ুম! পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড আর্তনাদের পর আর্তনাদ চতুর্দিক পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং এও বেশ বোঝা গেল যে, খুব ভারী একটা দেহ মাটির ওপরে পড়ে ছটফট করছে। অল্পক্ষণ পরে সব শব্দ থেমে গেল।

পিছন থেকে আবার কে বললে, শান্তি! অমাবস্যার রাতে আর এখানে বাঘ আসবে না!

কুমার একলাফে উঠে ফিরে দাঁড়িয়ে টর্চটা জ্বেলে ফেললে।

পিছনে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে করে মোহনলাল!

কুমার সবিস্ময়ে বললে, আপনি?

হ্যাঁ আমি। খানিক আগে আমাকেই আপনি ঝোপে-ঝাপে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

তাহলে আমাকে আর চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছিলেন আপনিই?

হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা এখন থাক, আগে দেখা যাক বাঘটা মরেছে কি না।

কুমার টর্চের আলো শুঁড়িপথের দিকে ফেলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। ...তার পরেই অত্যন্ত আশ্চর্য স্বরে সে বলে উঠল, কী সর্বনাশ! বাঘটা কোথায় গেল? ওখানে ও যে একটা মানুষের দেহ পড়ে রয়েছে।

দেহটার কাছে গিয়ে মোহনলাল কিছুই যেন হয়নি, এমনি সহজ স্বরে বললে, হ্যাঁ, এ হচ্ছে ভুলু-ডাকাতের দেহ। এর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

যা দেখা গেল, তাও কি সম্ভব? কুমারের মনে হল সে যেন কি একটা বিষম দুঃস্বপ্ন দেখছে।

মাটির ওপরে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে পটলবাবুর মৃতদেহ!

কুমার অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠল, অ্যাঃ! এ তো বাঘও নয়, ভুলু-ডাকাতও নয়– এ যে পটলবাবু!

মোহনলাল বললে, পটলবাবু? কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল, হঠাৎ দূর থেকে ঘন-ঘন অনেকগুলো বন্দুকের গর্জন শোনা গেল।

কুমার চমকে উঠে বললে, ও আবার কি?

ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের যুদ্ধ হচ্ছে। শিগগির আমার সঙ্গে আসুন বলেই কুমারকে হাত ধরে টেনে নিয়ে মোহনলাল দ্রুতপদে ছুটতে আরম্ভ করলে!

.

তেরো। আশ্চর্য কথা

কুমারের হাত ধরে মোহনলাল ছুটতে ছুটতে একটা চৌমাথায় এসে পড়ল। বাঁ-হাতি পথটা গেছে। কাজলা নদীর দিকে-যেখানে সুড়ঙ্গ-খালের সামনে ভুলু-ডাকাতের দলের সঙ্গে পুলিশের লড়াই বেধেছে!

মোহললাল সে-পথও ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কুমার বিস্মিত হয়ে বললে, একী মোহনলালবাবু! আমরা নদীর দিকে যাব যে!

না

না। তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আমার বাসায়।

সেখানে কেন?

দরকার আছে বলেই সেখানে যাচ্ছি। কুমারবাবু, এখন কোনও কথা কইবেন না, চুপ। করে আমার সঙ্গে আসুন...বাসায় দরজায় এসে ধাক্কা মেরে মোহনলাল বললে, ওরে, আমি এসেছি। শীগগির দরজা খোল।

দরজা খুলে গেল এবং ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সেই পাকা আমের মতন বুড়ো খোট্টা দরোয়ানটার মুখ।

বাড়ির দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতর ঢুকে একখানা চেয়ারের ওপরে ধপ করে বসে পড়ে মোহনলাল বললে, কুমারবাবু, বসুন। একটু হাঁপ ছেড়ে নিন।

খানিকক্ষর দুজনেই নীরব! তারপর প্রথমে কথা কইলে কুমার। বললে, মোহনলালবাবু, আপনার উদ্দেশ্য কি? যে-সময়ে আমার উচিত, চন্দ্রবাবুকে সাহায্য করা, ঠিক সেই সময়েই আমাকে আপনি এখানে টেনে আনলেন কেন?

মোহনলাল বললে, আপনার সাহায্য না পেলেও চন্দ্রবাবু হাহাকার করবেন না। আপনি না গেলেও তিনি যে আজ ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই নেই।

কুমার বললে, তবু আমার সেখানে যাওয়া উচিত।

মোহনলাল সে-কথার জবাব না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, কুমারবাবু আপনি Margaret A, Murrays Witch cult in Western Europe নামে বইখানা পড়েছেন।

এ-রকম খাপছাড়া প্রশ্নের অর্থ বুঝতে না পেরে কুমার বললে, না।

আপনি ডাইনি বিশ্বাস করেন?

ডাইনিদের অনেক গল্প শুনেছি বটে। সেসব গল্পে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করছেন কেন?

মোহনলাল আবার প্রশ্ন করল, কুমারবাবু, hydanthroby কাকে বলে জানেন?

না।

ইউরোপের ডাইনিরা নাকি hydanthroby-র মহিমায় মানুষ হয়েও নেকড়ে-বাঘের আকার ধারণ করতে পারত।

কুমার বিরক্ত হয়ে বললে, পারত, তো পারত, তাতে আমাদের কি?

কুমারের বিরক্তি আমলে না এনে মোহনলাল বললে, আমাদের দেশেও অনেকে বলেন, মন্ত্রতন্ত্র বা বিশেষ কোনও ওষুধের গুণে মানুষ নাকি বাঘের আকার ধারণ করতে পারে।

এতক্ষণে কুমারের মাথায় ঢুকল মোহনলাল কি বলতে চায়! একলাফে উঠে পড়ে কুমার উত্তেজিত স্বরে বলল, মোহনলালবাবু, মোহনলালবাবু! তবে কি আপনার মতে এখানকার অমাবস্যার রাতের বাঘটাও হচ্ছে সেইরকম কোনও অস্বাভাবিক জীব?

মোহনলাল গম্ভীর স্বরে বললে, আমার কোনও মতামত, নেই। মানুষ যে বাঘ হতে পারে, একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিজ্ঞানও তা মানে না কিন্তু মানসপুরে এই যেসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল, এর মূলেই বা কি রহস্য আছে?..গোড়া থেকে একবার ভেবে দেখুন। বাঘ দেখা দিয়েছে কেবল অমাবস্যার রাতে, ঠিক বারোটার সময়ে। সাধারণ পশুরা এমন তিথিনক্ষত্র বিচার করে ঘড়ি ধরে বেরোয় না এই অদ্ভুত বুদ্ধিমান বাঘের কবলে যারা পড়েছে, তারা সকলেই স্ত্রীলোক, আর তাদের সকলের গায়েই অনেক টাকার গহনা ছিল। সাধারণ বাঘ কেবল গহনাপরা স্ত্রীলোক ধরে না।...তারপর বুঝুন, আপনি আর আমি দুজনেই দুবার বাঘ দেখেছি, আপনি গুলি ছুঁড়েছেন, কিন্তু দুবারই বাঘের বদলে পাওয়া গেল মানুষকে অর্থাৎ পটলবাবুকে–প্রথমবারে আহত আর দ্বিতীয়বারে মৃত অবস্থায়। দুবারই বাঘের আবির্ভাব আমাদের চোখে পড়েছে, তার পায়ের দাগও দেখা গেছে, তার রক্তমাখা লোমও আমি পেয়েছি; কিন্তু তার দেহ অদৃশ্য হতেও আমরা দেখিনি অথচ তা খুঁজেও পাওয়া যায়নি। উপরন্তু দু দুবারই পটলবাবু যে কখন ঘটনাস্থলে এসেছেন, তা আমরা দেখতে পাইনি।...ইউরোপে এমনি মায়া-নেকড়ে বাঘের অসংখ্য কাহিনি আছে। সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে যখন তারা মরেছে, তখন আবার মানুষেরই আকার পেয়েছে।

কুমার রুদ্ধশ্বাসে, অভিভূত স্বরে বলে উঠল, তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, পটলবাবুই বাঘের আকার ধারণ করে–

মোহনলাল বাধা দিয়ে বললে, আমি ও-রকম কিছুই বলতে চাই না। আমি খালি দেখাতে চাই যে, সমস্ত প্রমাণ পরে-পরে সাজালে ঠিক যেন মনে হবে, কোনও মায়া-ব্যাঘ্রই মানসপুরের এই সব ঘটনার জন্যে দায়ী। যাঁরা এটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেবেন, তাঁদেরও মতে আমি সায় দিতে রাজি আছি। মানুষ যে ব্যাঘ্র-মূর্তি ধারণ করতে পারে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না–কারুকে আমি বিশ্বাস করতেও বলি না।

কুমার বললে, তবে

মোহনলাল আবার বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু এক বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই। ভুলু-ডাকাত আর পটলবাবু একই লোক। নিজে সকলের সামনে নিরীহ ভালো মানুষটির মতন থেকে পটলবাবু তার ভাঙা বাড়ির অন্ধকুপের মধ্যে ডাকাতের দল পুষতেন। কালুসর্দার তারই দলের লোক। অমাবস্যার রাতে বাঘের উপদ্রবের সুযোগে, তাঁরই হুকুমে কালু দল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরুত। নৌকোয় চড়ে সুড়ঙ্গ খাল দিয়ে ডাকাতেরা দল বেঁধে বাইরে বেরিয়ে আসত– গভীর রাত্রে কাজলা নদীর বুকে তাদের নৌকা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কুমার বললে, সবই যেন বুঝলুম। কিন্তু আপনি কে?

খুব সহজ স্বরেই উত্তর হল, আমি? আমি হচ্ছি মোহনলাল। অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি।

কুমার বললে, কিন্তু নিরীহ ব্যক্তির কাছে রিভলভার বন্দুক থাকে কেন?

মোহনলাল সহাস্যে বললে, সুন্দরবনে খুব নিরীহ ব্যক্তিরও রিভলভার-বন্দুক না হলে চলে না।

মানলুম কিন্তু তারাও রিভলভার বন্দুকের জন্যে লাইসেন্স নেয়। আপনার কি লাইসেন্স আছে?

না।

লাইসেন্স না নিয়ে রিভলভার-বন্দুক রাখে কেবল গুন্ডা, খুনে আর বদমাইশরা।

হু, একথা সত্য বটে।

তবে? কে আপনি বলুন।

মোহনলাল ঘর ঝাঁপিয়ে হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল!

কুমার দৃঢ় স্বরে বললে, পুলিশের ভয়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, সে কখনওই ভালো লোক নয়।

মোহনলাল কৌতুক ভরে বললে, ও আপনার কী বুদ্ধি কুমারবাবু! আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। আমি ভালো লোক নই।

কুমার বললে, বাজে কথায় ভুলিয়ে সেবার আমাদের চোখে আপনি খুব ধুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের সেটি আর হচ্ছে না।

মোহনলাল বললে, ওই শুনুন কারা আসছে!

নিচের সিঁড়িতে ধুপ ধুপ করে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল–যেন কারা বেগে ওপরে উঠছে! এ আবার কোন শত্রুর দল আক্রমণ করতে আসছে? কুমার তাড়াতাড়ি উঠে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল!

ঝড়ের মতো যারা ঘরের ভিতর এসে ঢুকল, তারা শত্রু নয়। চন্দ্রবাবু আর তার পাহারাওয়ালারা।

চন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, আরে, এ কী! কুমার, তুমি এখানে।

কুমার বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি মোহনলালবাবুর সঙ্গে আলাপ করছিলুম!

চন্দ্রবাবু বললেন, মোহনলাল? কোথায় সে দুরাত্মা? আমিও তো তারই খোঁজে এখানে এসেছি! আজ আমি ভুলু-ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করেছি, কেবল ভুলুকেই পাইনি। আমার বিশ্বাস, মোহনলাল ভুলু-ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়।

কুমার ফিরে দেখলে, মোহনলাল আর সে ঘরে নেই!

.

চোদ্দো । মোহনলাল গ্রেপ্তার

মোহনলাল যেখানে বসে ছিল, তার পিছনেই একটি বন্ধ দরজা–এ-ঘর থেকে আর একটা ঘরে যাবার জন্যে।

কুমার বললে, মোহনলাল নিশ্চয়ই ও-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে?

বাঘের মতো সেই দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রবাবু বললেন, মোহনলাল, এবারে আর তোমার বাঁচোয়া নেই! সমস্ত বাড়ি আমি ঘেরাও করে ফেলেছি, একটা মাছি পর্যন্ত এখান থেকে বেরুতে পারবে না। ভালো চাও দরজা খোলো।

ঘরের ভিতর থেকে সাড়া এল, আজ্ঞে, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মোহনলাল তো এ ঘরে নেই!

চন্দ্রবাবু রাগে গরগর করতে করতে বললেন, সেদিনকার মতো আবার আজ ঠাট্টা করা হচ্ছে। তুমিই তো মোহনলাল। শিগগির বেরিয়ে এসো বলছি?

আজ্ঞে, ভুল করছেন! আমি মোহনলাল নই।

আচ্ছা, আগে বেরিয়ে এসো তো, তার পর দেখা যাবে তুমি কোন মহাপুরুষ!

আজ্ঞে, আবার ভুল করছেন! আমি মহাপুরুষও নই।

চন্দ্রবাবু গর্জন করে বললেন, তবে রে ছুঁচো! ভাঙলাম তাহলে দরজা! বলেই তিনি দরজার ওপরে সজোরে পদাঘাত করতে লাগলেন।

আজ্ঞে করেন কী করেন কী! দরজা ভাঙলে বাড়িওয়ালা বকবে যে! আচ্ছা মশাই, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি এই নিন? হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

চন্দ্রবাবু রিভলভার বাগিয়ে ধরে, ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে বাধো বাধো স্বরে তিনি বললেন, এ কী! কে আপনি?

কুমারও অবাক! ও-ঘরের দরজার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, সে তো মোহনলাল নয়, সে যে বিমল, যার সঙ্গে কুমার দুবার যকের ধন আনতে গিয়েছিল, মঙ্গল গ্রহের বামনাবতারদের সঙ্গে লড়াই করেছিল, ময়নামতীর মায়াকাননের দানবদের সঙ্গে প্রাণ নিয়ে খেলা করেছিল। বিমল বিমল, তার প্রিয়বন্ধু বিমল, মানসপুরে এসে পর্যন্ত যার অভাব কুমার প্রতিদিন প্রতি পদে অনুভব করেছে, এমন হঠাৎ তারই দেখা যে আজ এখানে পাওয়া যাবে, স্বপ্নেও সে তা কল্পনা করতে পারেনি।

কুমার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, বিমল, বিমল, তুমি কোথা থেকে এলে! তুমি কি আকাশ থেকে খসে পড়লে?

বিমল হাসতে হাসতে বললে, না বন্ধু না! মোহনলাল রূপে গোড়া থেকেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি!

চন্দ্রবাবু হতভম্বের মতো বললেন, অ্যা, বলেন কি? আপনিই মোহনলাল?।

আজ্ঞে হ্যাঁ? এখন আসুন চন্দ্রবাবু, আমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিন।

ধাঁ করে কুমারের একটা কথা মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, আচ্ছা। বিমল, বাঘের গর্তে ডাকাতের কবল থেকে

বিমল বললে, হ্যাঁ আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছিলুম। কিন্তু এজন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই!..কুমার, পিছন ফিরে দেখ, ঘরের ভেতরে ও আবার কে এল!

কুমার ফিরে দেখে, একমুখ হাসি নিয়ে, দুপাটি দাঁত বের করে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলের পুরাতন ভৃত্য রামহরি!

কুমার বললে, কী আশ্চর্য। তুমি আবার কোত্থেকে এলে?

রামহরি বললে, আরে দুয়ো কুমারবাবু, দুয়ো! তুমিও আমাদের চিনতে পারনি! আমি যে নীচে দরোয়ান সেজে থাকতুম। পরচুলোর দাড়ি- গোঁফ ফেলে আবার রামহরি হয়ে, এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আরে দুয়ো কুমারবাবু দুয়ো! কি ঠকানটাই ঠকে গেলে!